বাঙালি ও বিহারি

- এস এম আছাব আলী

পনেরো বিশ বছর আগেও আমাদের অঞ্চলে ট্রেন ও গরুর গাড়ি ছিল প্রধান যানবাহন। সে জন্য ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর। ইনডিয়ার কলিকাতা থেকে কেরালা প্রদেশে কোচিন পর্যন্ত স্লিপার কোচে দুই দিন, দুই রাতের লম্বা ট্রেন জার্নি করেছি। আবার লন্ডনে পাতাল রেলে শর্ট জার্নিও করেছি।

সবচেয়ে আনন্দ ও বিষাদের ট্রেন ভ্রমণ ছিল ষাটের দশকে ছুটিতে বাড়ি আসা-যাওয়ায়। তখন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে চাকরি করতাম, কর্মস্থল ছিল করাচি বন্দর। সে সময় পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স-এর প্রতিদিন করাচি-ঢাকা কয়টি ফ্লাইট ছিল তা এখন মনে নেই। তবে আমরা সাধারণত রাতের ফ্লাইটে আসা-যাওয়া করতাম। সকালে এসে ঢাকা পৌছাতাম। নেভাল ট্রানজিট ক্যাম্পে রিপোর্ট করে সারা দিন ঢাকায় ঘুরতাম। রাত সাড়ে দশটায় বাহাদুরাবাদ মেল ট্রেন ধরতাম।

এক বছর পর বাড়ি আসার আনন্দই ছিল আলাদা। ট্রেন, যাত্রী, হট্টগোল, ভিড় সব কিছু ভালো লাগতো। ভোরবেলা বাহাদুরাবাদ ঘাটে এসে ট্রেন থামতো। এখানে ট্রেন বদল করে স্টিমারে উঠতে হতো। স্টিমারে একটি বেটে সাইজের ছেলে ফেরি করে বই বিক্রি করতো। তার কাছ থেকে কম দামে বই কিনতাম। সেই ছেলেটির কথা এখনো মনে পড়ে। ট্রেনের সঙ্গে স্টিমার ভ্রমণ যেন একটা বাড়তি পাওনা। এপাড় ফুলছড়ি ঘাটে স্টিমার থেকে নেমে ট্রেনে চড়ে মনে হতো করাচির চেয়ে ঢাকার মানুষরা গরিব এবং ঢাকা থেকে এই যমুনা নদীর এপাড়ের মানুষেরা আরো বেশি গরিব।

এক সময় ট্রেন চলা শুরু করতো। বোনারপাড়া, বগুড়া, সান্তাহার হয়ে নিজ স্টেশন তিলকপুরে নেমে পাচ কিলোমিটার পথ পায়ে হেটে সন্ধ্যার আগে বাড়ি এসে পৌছাতাম। মাকে দেখে মনে হতো, আমার মা আরো শুকিয়ে গেছেন, আরো কালো হয়েছেন, আরো গরিব হয়েছেন, আরো নোংরা শাড়ি পরেছেন।

আমরা ছিলাম একটি গরিব কৃষক পরিবার। মা-বাবা, ভাই-বোনদের খুব বেশি ভালোবাসতাম।

খুব আনন্দে ছুটির দিনগুলো কেটে যেতো। একদিন ছুটি ফুরিয়ে যেতো। সুটকেস হাতে তিলকপুর স্টেশনের পথে পা বাড়াতাম। মা-বাবা, ভাইবোনদের ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হতো। ছেড়ে যাওয়া ট্রেনের জানালা দিয়ে পেছনে তিলকপুর স্টেশনের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকতাম। রেলের ওপর দিয়ে ট্রেনের চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে চলতো। সান্তাহার, বগুড়া, বোনারপাড়া ছেড়ে রাতে ট্রেন ফুলছড়ি ঘাটে পৌছাতো। ওপারে বাহাদুরাবাদ ছেড়ে ময়মনসিংহ হয়ে সকালে ঢাকা পৌছাতাম।

তখন চাকরি জীবনের শুরুতে ঢাকা থেকে ট্রেনে চড়ে বাড়ি আসা-যাওয়ার দিনগুলো ছিল এমনি আনন্দ ও বেদনার।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনায় চাকরি করেছি। সব সময় ট্রেনে যাতায়াত করেছি। ট্রেন ভ্রমণের অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আজ সহযাত্রী একজন বিহারি মহিলা ও তার দুটি শিশুকে নিয়ে লিখবো।

১৯৮২ সালের কথা। তখন আমার কর্মস্থল ছিল কাপ্তাই। ছুটি শেষ করে ফিরছি। রাত প্রায় এগারোটার দিকে বাহাদুরাবাদ ঘাটে স্টিমার লাগামাত্র যাত্রীদের দৌড়াদৌড়ি শুরু হলো। ট্রেন দাড়িয়ে আছে, সিট পেতেই হবে। আমিও ব্যাগ হাতে দৌড় দিলাম।

চট্টগ্রামের জন্য নির্দিষ্ট বগিগুলো একেবারে ট্রেনের সামনে। আমার সেকেন্ড ক্লাসের টিকেট এবং সেকেন্ড ক্লাসের বগি মাত্র একটি। খুজতে খুজতে নির্দিষ্ট বগিতে উঠে দেখি বগি মানুষে ভর্তি। দরজার কাছে টয়লেটের পাশে দুই সিটের একটি খালি পেয়ে ব্যাগ রাখলাম। কিন্তু বগির ভেতর খুব হই চই চলছে। দেখলাম কয়েকজন যাত্রী একজন মহিলা ও দুটি বাচ্চাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বাইরে নিয়ে আসছে।

কেউ কেউ বলছে একেবারে ট্রেন থেকে নামিয়ে দাও।

তার বাচ্চারা এবং সে নিজে কাদছে ও অনর্গল উর্দুতে গালাগালি করছে, বাঙালি কেতনা হারামি হ্যায়।

আমারও জাত্যাভিমান আছে, সকলের মতো আমিও ব্যথিত হলাম। আবার ক্ষণিকের মধ্যে এটাও বুঝতে পারলাম, মহিলা মানসিকভাবে সুস্থ নয়। আমি এই অসুস্থ মহিলা ও তার শিশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য রাগান্বিত যাত্রীদের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানালাম।

অনেকেই আমাকে সমর্থন করলেন।

মহিলাকে বললাম, *বহেন, আপনা জবানকো রুখতো আউর মেরা সামনে বৈঠ।*

তাকে বোন ডাকাতে সে শান্ত হলো। তার মুখ বন্ধ করলো। এবং আমার সামনে পাটাতনের ওপর দুই শিশুসহ তার পুটলির ওপর বসলো।

বগিতে বাতি আছে। আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছি।

আমার পাশের যাত্রী নির্বিকারভাবে বিড়ি টানছে।

ট্রেন ছেড়ে দিল।

গভীর রাত, ট্রেনের ঝাকুনি, মনে হলো সবাই ঝিমুচ্ছে। বিহারি মহিলার দিকে তাকালাম। এক বাচ্চা তার কোলে, আরেক বাচ্চা তার পাজরে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আর লম্বা ঘোমটা টেনে মহিলা কাদছে।

আমার কৌতূহল হলো। একটু আগেই সে আমাদের *হারামি* বলে গালি দিয়েছে। তার নীরব কান্না আমাকে ব্যথিত করলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, কতোদূর যাবে?

সে বললো, চট্টগ্রাম।

সেখানে কেন যাচ্ছ?

আমার বাচ্চারা ক্ষুধার্ত।

সামনের স্টেশনে গাড়ি থামলে তোমার বাচ্চাদের খাবারের ব্যবস্থা করবো।

সে বললো, দেখুন ভাইয়া, বাচ্চাদের আপাতত খাওয়ার জন্য রুটি আমার পুটলিতে আছে, তবে এদের খাবার সংগ্রহের কোনো উপায় আমার নেই। এদের বাবা দেড় মাস আগে চট্টগ্রাম গেছে, মজুরি করছে। তার কাছে আমিও যাচ্ছি। দুজনে মিলে শুধু বাচ্চা দুটোকে বড় করবো।

তুমি কোথেকে আসছো?

মহিলা তার কাহিনী বললো এভাবে – সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে তার বাবা ছিলেন হেড মিস্ত্রি। তার স্বামী ও ভাই সেখানে চাকরি করতো। তাদের ধন–সম্পদ ছিল, মান–সম্মান ছিল, সুখ ছিল, সুখের সংসার ছিল। ১৯৭১–এ পাক–আমলে তারা বাঙালি ভাইদের আশ্রয় দিয়েছে, প্রশ্রয় দিয়েছে। তাদের বাবা ডেকেছে, ভাইয়া ডেকেছে, চাচা ডেকেছে, মামা ডেকেছে।

সে বললো, লেকিন বাঙালি লোক বহুত হারামি হ্যায় ভাইয়া। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেসব পরিচিত লোকেরাই আমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে, আমাদের ধন–সম্পদ, ইজ্জত সব লুটপাট করে আমাদের ঘরছাড়া করে।

মহিলা এবার উচ্চস্বরে আর্তনাদ করে কাদতে লাগলো।

তার বাচ্চারা ঘুম থেকে জেগে গেল।

সে এক অস্বাভাবিক, অনাকাঙ্ক্ষিত ও স্পর্শকাতর বিষয়ের সূচনা করলো।

আমাদের ইতিহাসে এক দুঃখ ও বেদনার বছর হলো ১৯৭১। ২৫ মার্চের সেই ভয়াল রাতের কথা বাঙালি জাতি কোনোদিনও ভুলবে না। আমিও ভুলিনি। বললাম, তখন বাঙালি, পাঞ্জাবি, বিহারি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, হননের পথ বেছে নিয়েছে। তখন কেউ কাউকে বিশ্বাস করেনি। পাকসেনা বিহারি ও

রাজাকারদের আঘাতে নির্দোষ এবং নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়েছে। হাজার হাজার পরিবার নিঃশেষ হয়েছে। তবু, তোমার পরিবারের জন্য হৃদয়ে বেদনা অনুভব করছি।

আপনে সহি কাহা।

মহিলা বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন। শুধু ভাষার কারণে আমরা নিঃশেষ হয়েছি ভাইয়া, আমাদের খুবই ছোট্ট একটি আশা, আমাদের সন্তান দুটো বড় হোক।

ঠিক এমন সময় আমার সহযাত্রীটি প্রতিবাদ করে উঠলো, আপনি এর সঙ্গে এতো উর্দু বলছেন কেন?

আমি উর্দু জানি, তাই।

আপনি ভুল করছেন।

আমি চমকে উঠলাম। মি. জিন্নাহও কি ভুল করেছিলেন? ১৯৪৮ সালে (দিন তারিখ মনে নেই) পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল ঢাকায় এলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, *একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।* আমার এ সহযাত্রীটির মতোই সেদিন সমগ্র জাতি এর প্রতিবাদ করেছিল।

বাহাদুরাবাদ মেল ট্রেনটি তখন রাতের অন্ধকার ভেদ করে ময়মনসিংহের দিকে ছুটে চলেছে। এই বিহারি মহিলা, তার দুটি অসহায় শিশু, শিশুদের নিয়ে তার আশা, স্বপ্ন, তার ভাষা ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে লাগলাম। সত্যি, মানুষের ভাবনার কোনো সীমা নেই। যা সে জানে তা নিয়ে যেমন ভাবে, যা সে জানে না তা নিয়েও তেমনি ভাবে। এই যেমন আমি। ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি কোনো বিষয়েই আমার সঠিক জ্ঞান নেই, তবুও কখনো কখনো বড় বড় বিষয় নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে। নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারি না। কিন্তু অন্যের ভুলগুলো (নিজস্ব চিন্তায়) কষ্ট দেয়। আমার মনে হয় জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দিয়ে ভুল করেছিলেন। ১৯৭১–এ ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে বন্দী করে ভুল করেছিলেন।

তারপর ১৯৭১–এর ১৬ ডিসেম্বর। স্বাধীনতার প্রথম সূর্যটি আমরা দেখলাম। আনন্দের মাঝেই আমাদের স্বাধীনতার দিনগুলো শুরু হলো। ১৯৭২–এর পর থেকেই দেখেছি জনগণ রাজনীতিবিদদের কথা বিশ্বাস করেছে। একদিকে সাধারণ মানুষ তার জীবিকা, তার ধর্ম। অন্যদিকে বড়দের রাজনীতি। একদল বলছে, সহযোগিতা, শান্তি, যুক্তির পথেই উন্নয়ন এগিয়ে চলবে। আরেক দল চাইছে ধ্বংস। মৃত্যুর মধ্যে, অপঘাতের মধ্যে, আত্মহত্যার মধ্যেই আত্মবিনাশ। সর্বত্র শুধু রহস্যময় সংশয় ও দ্বিধা। কোথাও বিশ্বাস নেই, আস্থা নেই, সহযোগিতা নেই।

শেখ মুজিব বাকশাল গঠন করে ভুল করলেন, রাজনীতিতে রাজাকারদের আশ্রয় দিয়ে জিয়াউর রহমান ভুল করলেন। তারপর নেতারা একটার পর একটা ভুল করতে লাগলেন। রাজনীতির জন্য ভুল, ক্ষমতায় যাবার জন্য ভুল, সম্মানের জন্য ভুল, সম্পদের জন্য ভুল, ধর্মের জন্য ভুল, অধর্মের জন্য ভুল, দেশের জন্য ভুল, দলের জন্য ভুল, পরিবারের জন্য ভুল এবং মানুষের জন্য ভুল করতে লাগলেন।

শুরুতেই বলেছি, ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার বহু পুরনো। কাকতালীয়ভাবে আজ ২০০৫ সালের ৮ মার্চ মঙ্গলবার এ লেখাটি লিখতে বসেছি। ৮ মার্চের সঙ্গে আমার ট্রেন ভ্রমণের আরো একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা আছে।

পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ দিবা গত রাতে সর্বশেষ ছুটিতে করাচি থেকে রাতের ফ্লাইটে ঢাকা আসি। ৮ মার্চ সারা দিন আন্দোলনরত জনতার মাঝে কেটেছে। যথানিয়মে রাত সাড়ে দশটার বাহাদুরাবাদ মেল ধরে বাড়ি এসেছি। রেলপথে ঢাকা থেকে বাড়ি আসা পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের মাঝে যে আন্দোলন দেখেছি তা আর কখনো দেখিনি। কিন্তু ততোদিনে মানুষ দশ ট্রাক অস্ত্রের কথা ভুলে গেছে, হ্যান্ড গ্রেনেডের মতো যুদ্ধাস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে এসে গেছে। অনেক মানুষ নিহত হয়েছে। আসাদুল্লাহ আল গালিব ধরা পড়েছেন, *বাংলাভাই* পালিয়ে গেছেন। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। যায়যায়দিন সাপ মার্কা প্রচ্ছদে *জঙ্গি দমনে টনক নড়েছে সরকারের* শিরোনামে কভার স্টোরি লিখেছে।

এই মুহূর্তে হয়তো আওয়ামী লীগ ৩০ এপৃল ও হরতাল নিয়ে ভাবছে, বিএনপি জোট সরকারকে নিয়ে ভাবছে আর আমি সেই বিহারি মহিলাকে নিয়ে ভাবছি। এক সাধারণ বিহারি মহিলা যেন আমাকে বললো, অন্যকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে বাধ্য করাকে স্বাধীনতা বলে না। চেয়ে দেখো, তোমার মা আরো শুকিয়ে গেছেন, আরো গরিব হয়েছেন, আরো নোংরা শাড়ি পরেছেন। তুমি অ, আ, ই, ঈ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে শিখো ক, খ, গ, ঘ, ঙ আবারও পড়ো।

ট্রেন থামার মৃদু ধাক্কায় আমার তন্দ্রা কেটে গেল। চোখ মেলে দেখি ভোর হয়েছে। ট্রেন গৌরীপুর স্টেশনে দাড়িয়ে। এখানে ট্রেনের কিছু শান্টিং কাজ চলবে।

কিছুটা সময় হাতে পাওয়া গেল। মহিলার দিকে তাকালাম। গালে হাত দিয়ে উদাসভাবে বাইরে তাকিয়ে আছে। শিশুরা চুপচাপ মায়ের কোলে, পাশে বসে আছে। রাতের কম আলোতে ভালোভাবে দেখা যায়নি। আজ ভোরে সূর্যোদয়ের প্রথম আলো যেন শিশুটির মুখের ওপর পড়েছে। অনাগত ভবিষ্যৎ তাদের কোথায় নিয়ে যাবে তা তারা জানে না। আবারও হয়তো একজন বুদ্ধদেব, একজন ঈসা (আ.) একজন মুহম্মদ (স.) পৃথিবীতে আসবেন। তখন মানুষে মানুষে, ভাষায় ভাষায়, ধর্মে ধর্মে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। কিন্তু ততোদিন কি এই বিহারি শিশু দুটি বেচে থাকবে? তারা জিন্নাহ, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, ভুট্টোকে চেনে না। তারা হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা দেখেনি। তারা শেখ মুজিব, ওসমানী, জিয়াউর রহমানকে দেখেনি। তারা ইনডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ জানে না। তারা শুধু জানে তারা বিহারি, তারা উর্দুতে কথা বলে। তারা খুব গরিব এবং অসহায়। আর পাকিস্তান তাদের কোনোদিনও ফেরত নেবে না।

আজ বাইশ বছর পর এ লেখাটি লিখতে বসে সেই বিহারি শিশু দুটির কথা মনে পড়ছে। প্রতিদিনে নিশ্চয় তারা বড়ো হয়েছে, যুবক হয়েছে। তারা কোনো পেশা বেছে নিয়েছে? ভালো, না মন্দ? আমাদের দেশ ভালো এবং মন্দের দেশ। ধনী এবং গরিব মানুষের দেশ। এখানে একদিকে ধনীদের বিলাস ও অপচয়। অন্যদিকে গরীবদের অনাহার, অর্ধাহার, অভাব, অনটন, বেকারত্ব। এখানে আমাদের সন্তানেরা প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার গাজা, হিরোইন, ফেন্সিডিল খাচ্ছে। শ শ লোক এই ব্যবসা করে ধনী হচ্ছে, আমরা বোবার মতো দেখছি। হায়, মানুষের ঈশ্বর কতো নিষ্ঠুর!

গৌরীপুর স্টেশনে নেমে একটি বিস্কিট ও এক কাপ চা খেলাম। ওই শিশু দুটির জন্য পাউরুটি, সিদ্ধ ডিম ও কলা নিয়ে ট্রেনে ফিরে এলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল।

সারা রাস্তা মহিলার সঙ্গে উর্দুতে কথা বলে কাটালাম। *বাঙালি লোক বহুত হারামি হ্যায়* – এ কথা সে আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করেনি।

একেবারে বিকেলে ট্রেন চট্টগ্রাম স্টেশনে এসে থামলো।

এখান থেকে আমি কাপ্তাই যাবো। বিকাল পাচটায় শেষ বাস। আমার খুব তাড়া ছিল। তবু তাদের পাশের হোটেলে নিলাম, পেট পুরে খাওয়ালাম। আমার কাছে যা সামান্য টাকা ছিল বাস ভাড়া রেখে সব দিলাম।

তারা হালিশহর যাবে। একজন বয়স্ক বেবিট্যাকসিচালক ঠিক করে তাকে খুবই বিনীতভাবে বুঝিয়ে বললাম, এই পরিবারটিকে যেন সঠিক ঠিকানায় পৌছে দেয়া হয়।

সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাংলায় বললো, তুমি খুব ভালো মানুষ ভাইয়া, আমার বাচ্চাদের জন্য দোয়া করো।

সে কাদছিল। আমি পকেট থেকে রুমাল বের করলাম। আমার ইচ্ছা করছিল তার চোখ দুটি মুছে দিই। কিন্তু তা হলো না। বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, আর কখনো গালি দেবে না।

সে মাথা নত করলো। বললো, আমি দুঃখিত।

বেবিট্যাকসি ছেড়ে দিল।

আমি কাপ্তাই বাসস্ট্যান্ডের দিকে পা বাড়ালাম। আমাকে শেষ বাসটি ধরতে হবে।

বড়গাছা, জয়পুরহাট থেকে
asabalibd@yahoo.com

শিনকানসেন : বুলেট ট্রেন অফ জাপান

- আশরাফুল হক কাজল

অতি দক্ষ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় রেলসেবা প্রদানকারী হিসেবে জাপান পৃথিবীতে অন্যতম। কঠোরভাবে সময়সূচি অনুসরণকারী, নিরাপদ, দ্রুত এবং সময়নিষ্ঠ এই রেল সার্ভিস প্রদান করে যাচ্ছে জাপান রেলওয়েজ গ্রুপ, সংক্ষেপে JR এবং সাতটি প্রাইভেট রেলওয়ে কম্পানি। মসৃণ, উচ্চগতির *শিনকানসেন* বা বুলেট ট্রেন থেকে শুরু করে জনাকীর্ণ কমিউটার (Commuter) পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের রেল সার্ভিস এরা পরিচালনা করে থাকে। JR পরিচালিত চার ধরনের ট্রেন সম্পর্কে আজ বর্ণনা করবো।

এক. **শিনকানসেন বা বুলেট ট্রেন :** এটি হচ্ছে একটি উচ্চ গতিসম্পন্ন ট্রেন সিসটেম যা জাপানের রেল পরিবহনের প্রাণকেন্দ্র। জাপানের অন্যতম প্রধান দ্বীপ হনশু-তে এই ট্রেন নেটওয়ার্ক বিস্তৃত রয়েছে যা টোকিও-র সঙ্গে এ দ্বীপের অধিকাংশ প্রধান শহর ও অন্য আরেকটি দ্বীপ কিউশু-র ফুকুওকা শহরকে যুক্ত করেছে। উত্তর অঞ্চলীয় দ্বীপ হোক্কাইদো এবং দক্ষিণের দ্বীপ শিকোকু এখনো এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়নি। শিনকানসেন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ পরিবেশনা রয়েছে লেখার শেষাংশে।

দুই. **এয়ারপোর্ট শাটল ট্রেন :** জাপানে প্রবেশে অন্যতম প্রধান এয়ারপোর্ট হলো মধ্যাঞ্চলীয় নারিতা অথবা দক্ষিণ অঞ্চলীয় কানছাই এয়ারপোর্ট। JR এই এয়ারপোর্ট ও বিভিন্ন শহরের মধ্যে যোগাযোগকারী অন্যতম স্বাচ্ছন্দময় শাটল ট্রেন সার্ভিস পরিচালনা করছে। নারতা বিমানবন্দর এবং টোকিও, শিনজুকু ও ইয়োকোহামা *স্টেশনের* মধ্যে চলাচলকারী *নারিতা এক্সপ্রেস* প্রতি ঘণ্টায় চলাচল করে এবং টোকিও *স্টেশন* পর্যন্ত যেতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় নেয়। কানছাই এয়ারপোর্টের সঙ্গে শিনওসাকা ও কিয়োটো *স্টেশনকে* যুক্তকারী *হারুকা ট্রেন* প্রায় প্রতি আধঘণ্টা পর পর চলাচল করে এবং ওসাকা শহর পর্যন্ত যেতে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা সময় নেয়।

তিন. **লিমিটেড এক্সপ্রেস ট্রেন (LEX) :** এ ধরনের ট্রেনের রয়েছে সারা জাপানে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক যা শিনকানসেনের সঙ্গে অন্যান্য বহু শহরের যোগাযোগ স্থাপনকারী। বিভিন্ন জনপ্রিয় পর্যটন শহরগুলোতেও এই সার্ভিস বিস্তৃত। এ ধরনের ট্রেন স্বল্প সংখ্যক স্টেশন ছাড়া সব স্টেশনে যাত্রা বিরতি করে না।

চার. **লোকাল ট্রেন :** নাম শুনলেই মনে ভেসে উঠে *নটার গাড়ি কটায় ছাড়ে* অবস্থার। কিন্তু না, এখানে চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিটি ট্রেন কঠোরভাবে সময়সূচি অনুসরণ করে। JR এবং অন্যান্য কম্পানি দৈনিক কমপক্ষে ত্রিশ হাজার ট্রেন পরিচালনা করে থাকে। শহরগুলোতে দেখা যায় জনাকীর্ণ। কিন্তু অতি দক্ষ কমিউটার যা শহরতলীর সঙ্গে শহরগুলোর যোগাযোগ রক্ষা করে। জাপানে রেল পরিবহন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং সুবিধাজনক পরিবহন মাধ্যম। অফিস, স্কুল-কলেজ শুরুর আগে সকালবেলা এবং ছুটির পর বিকালবেলা এই ট্রেনগুলোতে প্রচণ্ড ভিড় হয়। ট্রেনের বগিগুলোর দরজা বেশ প্রশস্ত। মেট্রপরিবহন এলাকায় লোকাল ট্রেনের চলাচল এতো ঘন যে, অবাক হতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ইয়ামানোতে লাইনে (টোকিও শহরকে বৃত্তাকারে যুক্তকারী লুপ লাইন) প্রতি তিন মিনিট অন্তর ট্রেন চলাচল করে। এ ধরনের ট্রেন প্রতিটি স্টেশনেই যাত্রাবিরতি করে।

এ দেশের প্রতিটি স্টেশনে রয়েছে কাউন্টার সার্ভিসের পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে টিকেট ক্রয় এবং চেকিংয়ের ব্যবস্থা। টিকেট ফাকি দেয়ার বা চেকারের সঙ্গে ব্যক্তিগত লেনদেনের কোনো সুযোগ নেই।

সর্বোপরি এ ধরনের মানসিকতাও যাত্রীদের নেই। স্টেশনে ঢোকার সময় এক সারিতে সাজানো গেটে টিকেট পাঞ্চ করে ঢুকতে হয় এবং গন্তব্য স্টেশনে বের হওয়ার সময় পুনরায় এই টিকেট মেশিনে ইন করাতে হয় গেট খোলার জন্য। দুই একজন স্টাফ দাড়ানো থাকে পর্যবেক্ষক হিসেবে। স্টেশনগুলো এবং ট্রেনের বগি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তকতকে। নিয়মিত ও রুটিনমাফিক রক্ষণাবেক্ষণের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। ফেরিওয়ালা বা দুষ্কৃতকারীদের অযাচিত, উৎকট ঝামেলা নেই।

জাপান রেলে দুই ধরনের বগি একটি কোচ বা *অর্ডিনারি কার,* অন্যটি প্রথম শ্রেণী কার বা *গৃন কার*। প্রায় সব শিনকানসেন, LEX এবং কিছু লোকাল ট্রেনে *গৃন কার*-যুক্ত। সব শিনকানসেন এবং LEX ট্রেনে রিজার্ভড ও নন-রিজার্ভড সিটের ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সিট খালি না পেলে দাড়িয়ে যেতে হবে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সিট পাওয়া যায়। ট্রেনগুলোর দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোলা বা বন্ধ হয়। দরজা যে জায়গায় এসে থাকবে ঠিক সেখানে দাগ দেয়া আছে প্ল্যাটফর্মে। যাত্রীরা আগে থেকেই সেখানে লাইনে দাড়ানো থাকে। নামার যাত্রীদের অগ্রাধিকার। প্রতিটি বগিতে এক প্রান্তে প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, গর্ভবতী মহিলাদের জন্য *প্রায়রিটি সিট* থাকে। ট্রেনের ভেতর ধূমপান, সেলফোনে আলাপচারিতা নিষেধ। যাত্রীরা চুপচাপ থাকে। বড়জোর নিচু স্বরে কথাবার্তা বলে। কেউ বা সংক্ষিপ্ত ঘুম সেরে নেয়। কেউ ব্যস্ত থাকে বই (বিশেষত মাঙ্গা, এক প্রকার সচিত্র জাপানি কমিক যা এখানে খুবই জনপ্রিয়) নিয়ে। কেউ ব্যস্ত থাকে সেলফোনে গেম বা সি-মেইল নিয়ে।

টোকিওর পাতাল রেল নেটওয়ার্ক এতো বিস্তৃত যে, মনে হয় টোকিওর পাতালে আরেক টোকিও। পাতাল রেল স্টেশনগুলো বিশাল আকৃতির এবং একাধিক বহির্গমন, প্রবেশ মুখ থাকে। কোনো কোনোটি মাটির নিচে একাধিক তলায় বিস্তৃত।

বাংলাদেশের রেলস্টেশনগুলোর (মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া) একটি ব্যাপার বরাবরই আমার কাছে উদ্ভট মনে হয়। সেটি হলো প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা। আমাদের প্ল্যাটফর্মগুলো ট্রেনের বগির দরকার লেভেল থেকে অনেক নিচে অবস্থান করে। বগিতে ওঠা-নামা করতে হলে দুই তিন সিড়ি মাড়াতে হয়। সিড়িগুলোর অবস্থান এমন খাড়া যে, দুই হাতে বগির হ্যান্ডল ধরে লাগেজ নিয়ে ওঠা-নামা করার ঝক্কি-ঝামেলা সবারই জানা। তাছাড়া বয়স্ক ও শিশুদের ক্ষেত্রে ভোগান্তি তো রয়েছেই। বৃটিশ নির্মিত ডিজাইনের এ ত্রুটি কি আমরা এই আধুনিক যুগেও বহন করে চলবো? যে গুটিকয়েক দেশ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সেখানে দেখেছি প্ল্যাটফর্মগুলো বগির দরজার লেভেলে অবস্থিত যাতে ওঠা-নামায় স্বাচ্ছন্দ থাকে।

এবার শিনকানসেন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা যাক। দেশটিতে শিনকানসেন নেটওয়ার্ক প্রথম চালু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। তখন এর গতি ছিল অপেক্ষাকৃত কম, প্রায় দুইশ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। শুরু থেকে এ পর্যন্ত একটিও মারাত্মক দুর্ঘটনা ছাড়া প্রায় ৬ বিলিয়নের বেশি যাত্রী পরিবহনের কৃতিত্বের দাবিদার এই শিনকানসেন নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক কেবল তার উচ্চগতিই (যা ঘণ্টায় সর্বোচ্চ তিনশ কিলোমিটার) নয়, পরিচালনা সংখ্যার দিক দিয়েও উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ স্বরূপ, টোকিও এবং শিন ওসারা স্টেশনের মধ্যে দিনের বেলা প্রতি ঘণ্টায় (প্রতিদিন নয়!) ছয়টি শিনকানসেন ট্রেন চলাচল করে।

নেটওয়ার্কের একেক অংশের ভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন : *তোকাইদো, কিউশু, সানয়ো, তোহোকু শিনকানসেন* ইত্যাদি। প্রতিটি অংশে চলাচলকারী শিনকানসেন আবার একাধিক প্রকারের। উদাহর স্বরূপ, টোকিও এবং শিন ওসাকা (তোকাইদো শিনকানসেন) স্টেশনের মধ্যে চলাকলকারী শিনকানসেন তিন ধরনের – *নযোমি, হিকারি ও কোদামা*। নযোমি ট্রেনগুলো শুধু অতি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে থামে এবং টোকিও থেকে ওসাকা প্রায় আড়াই ঘণ্টায় পৌছে। হিকারি ট্রেনগুলো নযোমি ট্রেনের চেয়ে একটু বেশি সংখ্যক স্টেশনে যাত্রাবিরতি করে এবং উপরোক্ত গন্তব্যে পৌছে প্রায় তিন ঘণ্টায়। আর কোদামা শিনকানসেন পথে সবগুলো স্টেশনে যাত্রাবিরতি করে এবং গন্তব্যে পৌছাতে বেশি সময় নেয়। টোকিও এবং শিন-ওসাকার মধ্যে যাতায়াতে তোকাইদো শিনকানসেনে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। স্বভাবতই শিনকানসেনে ভ্রমণ বেশ ব্যয়বহুল

এবং এ পথে রাউন্ড ট্রিপ ভাড়া বাংলাদেশি টাকায় প্রায় চোদ্দ হাজার। এটি ছিল নযোমি শিনকানসেন এবং পথিমধ্যে শুধু নাগোয়া ও কিয়োটো স্টেশনে অতি সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি করে।

এই শিনকানসেনটি বেশ দীর্ঘ, প্রায় পনেরোটি লম্বা বগিযুক্ত। বগিগুলোর অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। অভ্যন্তর ভাগ বিমানের অভ্যন্তর সদৃশ। সুন্দর প্লাস্টিক প্যানেলে তৈরি। উচ্চগতির কারণে জানালাগুলো ফিক্সড। চেয়ারগুলো একদিকে মুখ করে সুবিন্যস্ত। কিন্তু এগুলো ঘুরিয়ে একে অপরের মুখোমুখি করা যায় যা গ্রুপ ভ্রমণের সময় উপযোগী।

জানালা দিয়ে অতিদ্রুত ধাবমান দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। অর্থাৎ ট্রেনটি তখন কোনো পাহাড়ের পেট ফুড়ে টানেলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। হাস্যময়, পরিপাটি হস্টেসরা অন বোর্ড ফুড কার্ট (Food Cart) নিয়ে যাত্রীদের সেবায় হাজির হয়। প্রতিটি শিনকানসেনে স্মোকিং এবং নন-স্মোকিং বগি থাকে। টিকেট কেনার সময় পছন্দ উল্লেখ করতে হয়। প্রতিটি বগিতে যুক্ত থাকে প্রসাধনী কর্নার এবং টয়লেট। সব শিনকানসেন এবং কিছু LEX ট্রেনে পাবলিক টেলিফোনের (ডমেস্টিক কল) ব্যবস্থা আছে। কিছু শিনকানসেন আছে যা ডাবল ডেকড বা দোতলা।

টোকিও এবং ওসাকার মধ্যে চলাকলকারী তোকাইদো শিনকানসেন ছিল প্রথম উচ্চগতির ট্রেন যা ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে উদ্বোধন করা হয়। প্রথম দিকে এর গতি ছিল ঘণ্টায় দুইশ কিলোমিটার পর্যন্ত। কিন্তু অবকাঠামো, সিগনালিং ও রক্ষণাবেক্ষণের উন্নয়নের মাধ্যমে তা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ঘণ্টায় প্রায় তিনশ কিলোমিটারে পৌছেছে। এই শিনকানসেনগুলো সিরিজ-৩০০-এর আওতাভুক্ত। বহুল ব্যবহৃত এবং উচ্চগতির এই ট্রেন অবকাঠামোর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। ফলে মোট পরিচালন খরচের এক-তৃতীয়াংশই চলে যায় রক্ষণাবেক্ষণ খাতে। শিনকানসেন মূলত গতানুগতিক স্টিলরেল (কংক্রিট স্লিপারের ওপর স্থাপিত)-এর ওপর চলাচল করে। তবে অপেক্ষাকৃত মন্থরগতির ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে আলাদা ট্র্যাক ব্যবহার করে। ট্র্যাকের উভয় পাশে বেড়া অথবা দেয়াল দিয়ে সংরক্ষিত। শিনকানসেন দুই ধরনের গেজ-এর ওপর চলাচল করে - ১.০৬৭ মিটার এবং ১.৪৩৫ মিটার।

সিরিজ-৩০০-এর পর এখন এসেছে সিরিজ-৫০০ শিনকানসেন যার গতি আগের চেয়ে আরো বেশি। অতিমাত্রায় শব্দ-নিরোধক বগি তৈরির ফলে ট্রেনের ভেতর যাত্রীদের উচ্চগতিজনিত অনুভূতি কম হয় এবং বাতাসের শব্দ সর্বনিম্ন হয়। এরোডাইনামিক ডিজাইনের ফলে এর পাওয়ার কার-এর নাম হয় লম্বা, অনেকটা বুলেট-এর মতো দেখতে। শিনকানসেন-এর উত্তরোত্তর গতি বৃদ্ধি এবং উৎকর্ষের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে ইতিমধ্যে জাপান রেলওয়ে সাফল্যজনকভাবে এমন একটি অতি উচ্চগতির পরীক্ষামূলক ট্রেন পরিচালনা সম্পন্ন করেছে যার গতি ঘণ্টায় পাচশ কিলোমিটার।

এটি *সুপারকন্ডাক্টিং ম্যাগলেভ ট্রেন* নামে পরিচিত। এতে ব্যবহৃত হয়েছে Magnetic Levitation (Maglev) টেকনলজি যা চৌম্বুকশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যানবাহনকে মধ্যাকর্ষণের বিপরীতে বাতাসে ভাসতে সাহায্য করে। এতে গতির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে লিনিয়ার মোটর (Linear motor)। এ সমস্ত কারণে ঘর্ষণ ও কম্পন কমে যাওয়ায় উচ্চগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে।

সুকুবা সায়েন্স সিটি, জাপান থেকে

মেঘ না চাইতে

- অনিরুদ্ধ বিশ্বাস

বাতি নেভানো অন্ধকার ঘরে গায়ের ওপর একটা চাদর ফেলে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙলো।

মা বললেন, কি রে, আজ যাবি না।

আমার বাড়ি চাপাইনবাবগঞ্জ। পড়তাম রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে বাংলা নিয়ে। তাই হস্টেলেই থাকতে হতো। এ কারণে ছুটির সময় ট্রেনেই যাতায়াত করতাম। তখন রাস্তাঘাটের অবস্থা মোটেই উন্নত নয়। উপরন্তু বাস ও টেম্পোর স্বল্পতার কারণেও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য ট্রেনই ছিল দূরযাত্রার মুখ্য পরিবহন।

বিছানা ছেড়ে ট্রাকসুট গায়ে চাপিয়ে দৌড়াতে বের হলাম। আধা ঘণ্টা জগিং করে গোটা ত্রিশেক বুক-ডাউন দেয়া আমার নিত্যদিনের অভ্যাস। প্রতিদিনের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সারতে মানুষকে যেমন টয়লেটে যেতেই হয় তেমনি জগিং করার জন্য প্রতিটি ভোরে আমাকে রাস্তায় বের হতেই হয়। একটা দিন ব্যায়াম না করলে খুব অস্বস্তি শুরু হয় আমার। তাই শারীরের ম্যাজম্যাজানি থেকে রেহাই পেতে কোনো গাফিলতি ছাড়াই নিয়মিত ব্যায়াম করি।

যাহোক ব্যায়াম ও প্রাতঃরাশ সেরে মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে রাজশাহী যাবার উদ্দেশ্যে ট্রেন স্টেশনের দিকে এগোলাম।

তখন ট্রেনে খুব বেশি যাত্রী হতো। প্ল্যাটফর্মে দেখি প্রচণ্ড ভিড়। লোকজন টিকেট কাটার জন্য লম্বা লাইনে দাড়িয়েছে। হুড়োহুড়ির মাঝে বহু কষ্টে টিকেট কাটলাম। এরই মাঝে ঘটে গেল একটা ঘটনা।

বহু আগে থেকেই আমার কবিতা লেখার বাতিক ছিল। রাস্তা, পার্ক, বাগান কিংবা ছাদে যেখানে যে পঙক্তি মাথায় আসতো সেখানেই দুই এক ছত্র লিখে ফেলতাম। এ কারণে রাইটিং প্যাড বা এক টুকরো কাগজ সব সময় আমার সঙ্গে থাকতো। দুর্ভাগ্যবশত, না সৌভাগ্যবশত, কোনটা বলবো জানি না, হঠাৎ করে আমার ডায়রি থেকে একটি কবিতা লিখিত কাগজ পড়ে গেল ওই লোক ভর্তি প্ল্যাটফর্মে।

এরপর যা ঘটলো সেটা আরো অপ্রত্যাশিত। হঠাৎ মেয়েলি কণ্ঠে পেছন থেকে কে যেন ডাকলো, এই যে শুনুন।

প্রথমে পাত্তা দিলাম না। মনে করলাম আমাকে নয়, হয়তো অন্য কাউকে ডাকছে। কারণ এই লোক ভর্তি রেলস্টেশনে কোনো মেয়ে কেনই বা ডাকতে যাবে আমাকে! মনকে প্রবোধ দিলাম ভুল শুনেছি বলে। কিন্তু আরেকবার ডাকার ফলে ফিরে তাকাতেই হলো।

পেছন ফিরে তাকাতেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। এক অকল্পনীয় সুন্দরী নারী আমার সামনে দাড়িয়ে। রূপের চ্ছটায় আমার মুখে যেন তালাবদ্ধ হয়ে গেল, কথা বলতে পারলাম না। মেয়েটি কবিতার কাগজটি এগিয়ে ধরে বললো, এই নিন, পড়ে গিয়েছিল।

কম্পিত হাতে কবিতাটি নিয়ে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানালাম।

মেয়েটিও ধন্যবাদের প্রতুত্তোর জ্ঞাপন করে ধীরে পায়ে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেল।

হঠাৎ টেনের হুইসল বেজে উঠলো। ঘুমন্ত ট্রেনটা যেন গর্জন করে কুম্ভকর্ণের মতো আচানক জেগে উঠলো। যাত্রীরা দৌড়াদৌড়ি করে ট্রেনে উঠতে ব্যস্ত। কিন্তু আমার কোথায় গেল ছুটোছুটি, কোথায় ব্যস্ততা বাস্তবতার! প্রেমের হাওয়া বইলো মনে সংগোপনে। অতি নির্জনে, ক্ষণে ক্ষণে কার ছবি ভেসে উঠলো মনে। এমন রূপ দেখে কবি হয়ে যেতে ইচ্ছা করছে, ইচ্ছা করছে কবিতা লিখতে। কিন্তু বাস্তবতা মানতেই হবে, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

দৌড়ে চলন্ত ট্রেনটার একটা বগিতে উঠে পড়লাম।

সেদিন বিধাতার কাছে সহস্র কোটিবার শুকরিয়া আদায় করেছিলাম। কারণ যে বগিতে উঠেছি তাতেই দেখি মেয়েটি বসে আছে।

মেয়েটির সামনের সিটে বসলাম। প্রায় এক ঘণ্টা আমরা মুখোমুখি নীরবে বসে আছি। ইচ্ছা করছিল এভাবে মৌন না থেকে কিছু বলি। কিন্তু কি বলবো!

কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য এর আগে আগ্রহের এতোটা আতিশয্য দেখাইনি। কিন্তু এ মেয়েটিকে দেখার পর আমার মনের মাঝে তোলপাড় শুরু হয়েছে যা এর আগে কখনো হয়নি। আমার মনকে মেয়েটির

অদৃশ্য মোহিনী শক্তি তার অলৌকিক ক্ষমতাবলে তিলে তিলে সর্বদা নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে। আমি নিরুপায়, আমার মন যে বাধা পড়েছে অপরের ইন্দ্রজালে।

অপরূপ রূপের মোহে আসক্ত হয়ে যখন লজ্জাহীনভাবে ভাবছি মেয়েটির সঙ্গে কিভাবে কথা বললো ঠিক তখনই মিষ্টি হেসে মেয়েটি বললো, আপনি যাবেন কোথায়?

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি।

ওখানে পড়েন বুঝি?

হ্যা, আপনার গন্তব্য?

সে বললো, আমিও ইউনিভার্সিটিতেই পড়ি, ওখানেই যাবো।

বুকের মাঝে কাপুনি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো ডিপার্টমেন্টে?

উত্তর এলো, বাংলায়।

মেঘ না চাইতেই যেন বৃষ্টি পেলাম। এভাবে কাকতালীয়ভাবে যার সঙ্গে পরিচয় তার সঙ্গে আমার এতোটা মিলে যাবে ভাবতে পারিনি।

প্রথমে আমাদের ঠিকানা বিনিময় হলো। তা থেকেই শেষ পর্যন্ত আমাদের মাঝে প্রেম হলো।

মহারাজপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

স্বাধীনতার পরে

- মোহাম্মদ এনামুল আযীম

১৯৭২ সালে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন কাজ চলছে। বিশেষ করে ইনডিয়া ও রাশিয়ার সহায়তায় সড়ক, রেলপথ ও বৃজ নির্মাণের কাজ চলছে দ্রুত গাড়িতে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমরা শহর ছেড়ে গ্রামগঞ্জে, কখনো ইনডিয়ার বিভিন্ন স্থানে কাটিয়েছি। ওই সময় উদ্বাস্তু জীবনের অনাহার-অনাদর ও অনিয়মের মধ্যে পড়ে আমার পরবর্তী ছোট ভাইয়ের পায়ের আঘাত থেকে ক্রমে টিউমারে রূপ নেয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালের ১৬ নাম্বার টিনশেড ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয়। অবশেষে *মাইয়োসারকুমা*-র জন্য ডান পা-টা সম্পূর্ণভাবে জংঘা থেকে বাদ দিতে হয়েছিল।

আমার এসএসসি পরীক্ষার জন্য ওকে দেখতে যেতে পারিনি। পরীক্ষা শেষে আরেকজন বন্ধুসহ আমরা ঢাকা যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। যুদ্ধের শেষের দিকে পাকবাহিনী হার্ডিঞ্জ বৃজের তিনটা স্প্যান সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেয়ায় খুলনা থেকে ঢাকা যেতে প্রধান রেলপথ সিরাজগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ পথ বন্ধ। তখনো পাকশী বৃজের কাজ রাশিয়ানরা করছে। তবে তুলনামূলক কম ক্ষতি হওয়াতে গড়াই সেতুর কাজ দ্রুত শেষ হওয়ায় খুলনা থেকে গোয়ালন্দ হয়ে ঢাকার যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

এ পথে গোয়ালন্দ পর্যন্ত এসে রেলওয়ে ফেরিতে আরিচা আসতে হতো। পরে আরিচা থেকে জনপ্রতি তিন টাকা রিজার্ভে পনেরো টাকার বিনিময়ে ট্যাক্সিক্যাব পাওয়া যেতো। পথের মধ্যে মাইলের পর মাইল ধুলো উড়িয়ে নয় দশটা ফেরি পার হয়ে গুলিস্তান পর্যন্ত আসতে বেশ সময় লাগতো। গোয়ালন্দ মেইল এ পথের অন্যতম বাহন। দুই বন্ধু আগের দিন রাতের মধ্যেই চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে এসে আশ্রয় নিয়েছি। ট্রেনের সময় ভোর পাচটা। ট্রেনটা যথাসময়েই চলে। তবে ইদানীং ইনডিয়া থেকে আগত মালবাহী ও যাত্রীবাহী বগি সংযুক্ত করার জন্য দর্শনা হল্টে পনেরো বিশ মিনিট দেরি হয়।

নিজের ইচ্ছার ওপর ভর করে এটা আমার প্রথম যাত্রা। ফলে আশংকা ও কৌতূহল দুটোই তখন চরমে। ভোররাতে লাইনে দাড়িয়ে টিকেট কিনলাম। কোনো শ্রেণী নেই, সব টিকেটের দাম ও মান একই। এ এক বিশাল সমতা।

যথাসময়ে ধোয়া উড়িয়ে, বাষ্প ছেড়ে, সিটি বাজিয়ে দৈত্যকার ইঞ্জিনটি আমাদের ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে থেমে গেল। সমস্ত গাড়িতে তিল ধারণের জায়গা নেই। কোথায় কিভাবে উঠবো দিশাহারা হয়ে পড়লাম। কোনোদিকে না তাকিয়ে বগিতে ওঠে পড়লাম।

ভাগ্যক্রমে দরজার সামনেই টয়লেটের সঙ্গে দুই সিটের একটি আসন ফাকা পেয়ে নিশ্চিন্তে ব্যাগবোচকা নিয়ে বসে পড়লাম। কোনোদিকে খেয়াল করার সুযোগও পেলাম না। ট্রেন ছেড়ে দিল।

মুহূর্তের মধ্যে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক পরোটা ভর্তি দুইটা ঠোঙ্গা নিয়ে লাফ দিয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে বগির ভেতর থেকে নয় দশ বছরের ও বারো তেরো বছরের দুটো মেয়ে এসে জিনিসগুলো নিতে সাহায্য করলো। নিচ থেকে আরেকজন হেটে হেটে ডাল, মিষ্টি, কলা, পানি প্রভৃতি সরবরাহ করলো।

প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে গেলে ভদ্রলোক দরজা ভালোভাবে বন্ধ করে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন যেন ভূত দেখছেন। এতোক্ষণে মনে হলো তিনি মেয়েদের নিয়ে এ সিটেই ছিলেন এবং আমাদের খেয়াল করেননি। ওনার তাকানো দেখে দুজনেই সিট ছেড়ে উঠে দাড়ালাম।

ভদ্রলোক উর্দুতে বসতে বলে দরজার জানালায় ঠেস দিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরেই মেয়ে দুটো যোগ দিল, তাদের উচ্ছ্বাস, কথাবার্তা সবই উর্দুতে, কিছুই বুঝতে পারছি না। বগির ভেতরে উকি দিতেই আমাদের অস্বস্তিটা আরো বেড়ে গেল। সেখানে আমাদের মতো সাধারণ বেশের কোনো মানুষ নেই।

সমস্ত বগি ও বাংকারের অধিকাংশই বড় বড় লাগেজ ভর্তি। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, মাঝবয়সী কিশোর ও শিশুরা সিটে-বাংকারে শুয়ে-বসে, হেলান দিয়ে বা ঘুমিয়ে আছে। কোনো হই চই নেই। মাঝে মধ্যে অল্প স্বরে কিছু কথা শোনা যাচ্ছে। অত্যন্ত রুচিশীল পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার সজ্জিত কথাবার্তায় মার্জিত। কিন্তু সর্বত্রই মলিনতার ছাপ।

সবার মুখেই ক্লান্তি ও উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট। মেয়েদের সুন্দর মুখে, চোখের চারপাশের কালো ছাপ এতোই স্পষ্ট যে কারো দেখলেই কষ্ট লাগবে। অনুমান করতে অসুবিধা হলো না যে, বগিটা ইনডিয়া থেকে এসেছে এবং এখানে পাচ ছয়টি পরিবার আছেন।

ভাবছি কুষ্টিয়া নেমে বগি বদল করবো। এর মধ্যে বগির সবাই বেশ কলরবের সঙ্গে নাশতা সেরে নিয়েছেন। আবারও আয়েশের পালা।

মাঝবয়সী এক শ্যামলা ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। শার্ট ও টাইয়ের নট আলগা, পায়ে স্লিপার, হাতে পরাটা ও মিষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন।

উঠে ওনাকে বসতে বললাম। তিনি উর্দুতে ও ইশারায় দুইটা করে পরোটা ও মিষ্টি নিতে বললেন।

অনেক ইতস্তত করে একটা করে নিলাম।

ভাঙা ভাঙা বাংলা, যদিও উর্দুর পরিমাণই বেশি। তিনি জানতে চাইলেন, আমরা কি করি, কোথায় যাবো এবং কেন যাবো?

মনে হলো এদের মধ্যে তিনি একমাত্র বাংলা বোঝার মতো ব্যক্তি।

উত্তরগুলো ধীরে কিন্তু গুছিয়ে বললাম।

ভদ্রলোক স্নেহমাখা হাত আমাদের মাথায় বুলিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরেন এসে আবার বসলেন এবং ওনাদের কথা শোনালেন।

এখানে যে ছয়টা পরিবার আছেন তাদের একজনের পূর্বপুরুষ নোয়াখালীর এবং বাকিরা চট্টগ্রাম থেকে বৃটিশ আমলে করাচিতে সেটলড হয়েছেন। প্রায় তিন চার পুরুষ সেখানে। ওখানেই ব্যবসা, চাকরি ও প্রতিষ্ঠা। মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়েও মোটামুটি ভালো ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর করাচিতে দাঙ্গা বাধে। এতো দিনের পরিচিতজনরা হঠাৎ বৈরী হয়ে ওঠে। পুড়িয়ে দেয় ঘর–বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। চারজন নিহত হন। অবশেষে কাফেলার সঙ্গে কাবুল, তুর্কিস্তান ঘুরে কাশ্মির হয়ে ইনডিয়ায় এবং গতকাল রাতে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবেশ। এই দীর্ঘ ভ্রমণে দুজন বৃদ্ধ ও একজন শিশুকে হারিয়েছেন এরা।

সমস্ত শোনার পর অনেক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইলাম।

মার্চের কুয়াশা সরিয়ে ক্রমেই ভোরের আলো বেরিয়ে আসছে। কৃষকরা শিশির ভেজা মাঠে ডোনের পানিতে সেচ দিচ্ছে।

গেটের ভদ্রলোক দুই মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত উৎফুল্লচিত্তে আলাপ করছেন। পাশের জানালা বরাবর মুখোমুখি দুটো সিটে দুজন ভদ্রমহিলা বসা। সম্ভবত একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী, অন্যজন বোন। কোলের ছয় সাত মাসের ফুটফুটে কন্যা সন্তানটি মাঝে মধ্যেই কোল বদলের খেলা করছে।

কখন কুষ্টিয়া ছেড়ে এসেছি টের পেলাম না। তবে বুঝলাম সদস্য মেরামত করা গড়াই বৃজের নোটিশ মোতাবেক অতি ধীরে ট্রেন বৃজ পাস করছে। এই সুযোগে আশপাশের ছয় সাতজন মানুষ দরজার পাদানিতে হ্যান্ডল ধরে ঝুলে পড়েছে।

বড়াইকোল পার হয়ে গাড়ির গতি কিছুটা বাড়ার সঙ্গে আমাদের ঝিমুনিও বাড়ে। হঠাৎ নারী কণ্ঠের আর্ত চিৎকারে লাফিয়ে উঠলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি গেট খোলা এবং গেটের ভদ্রলোক নিচে পড়ে গেছেন।

ছুটে গেট পর্যন্ত যেতেই বারো তেরো বছরের মেয়েটি লাফিয়ে পড়লো।

কোনো রকম ছোট মেয়েটিকে ধরলাম। কোনো কাজ হলো না। *ঠের না* বলে ঝাটকা মেরে আমাদের পেছনে ফেলে ঝাপ দিল!

বগির মধ্যে শোকের মাতম। আমরা কাউকেই সান্ত্বনা দিতে পারছি না, বরং কাদছি।

স্ত্রী ভদ্রমহিলা জানালা গলে প্রায় ঝাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের টেনে ধরায় পারলেন না, মেঝেতে পড়ে মূর্ছা গেলেন।

মোটামুটি এক মাইলের মধ্যে চার চারজনের পতন ট্রেনের লোকজন দেখলো কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে।

জানালা দরজা দিয়ে বিভিন্নভাবে গাড়ি থামানোর জন্য ড্রাইভার ও গার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে অনেকে। একজনকে দেখলাম দরজা বেয়ে ছাদে ওঠে ইঞ্জিনের দিকে দৌড়াতে।

কিছুক্ষণ পর গতি কমলো এবং গাড়িটি পেছাতে শুরু করলো। এতোক্ষণে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় চার পাচ মাইল এগিয়ে গেছি।

মনে মনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন মৃত্যুর মতো দুর্ঘটনার মুখোমুখি না হতে হয়। সর্বস্ব হারিয়ে এক বুক আশা নিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশের ভোরের বাতাস যে প্রাণগুলোকে সমস্ত শোক ও ক্লান্তি ভুলিয়ে প্রাণোচ্ছল করেছিল, কিছুক্ষণ আগেও যাদের মুখের কালো বলিরেখার মাঝে অনাবিল প্রশান্তির ছোয়া দেখেছিলাম তা যেন অটুট থাকে। আজকে মৃত্যুর মতো ঘটনা ওদের জীবনে দেশের প্রতি স্থায়ী ঘৃণার জন্ম দেবে।

কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম লাইনের ধারে কৃষক ও গ্রামবাসীদের জটলা। আহতদের কাপড় ভেজা। বুঝলাম গ্রামবাসী তাদের সাধ্যমতো সেবা দিয়েছেন।

সবাই জীবিত আছেন।

ভদ্রলোক হাটতে পারছেন না, ডান হাত ও পায়ে বেশি মাত্রায় চোট পেয়েছেন।

মেয়ে দুটোর কপাল হাতের নিচ ও পায়ের পাতার জখম থেকে তখনো রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বগিতে ওঠার পর পরস্পর জড়িয়ে ধরে আরেকবার কান্নাকাটি হলো।

আমাদেরও দুচোখ ভাসলো। তবে সে কান্না ছিল হারিয়ে পাওয়ার।

এবার দুজন রেল পুলিশসহ বাকি পথটুকু পাড়ি জমালাম।

এখনো স্মৃতির পাতায় ওই ঘটনা ও মুখগুলো ভেসে বেড়ায়। জানি না তারা এখন কে কোথায় কেমন আছেন? তবে আমার যে ভাইটাকে দেখার জন্য যাচ্ছিলাম সে ১৯৭৩ সালে মারা গেছে।

ঘটনার শুরুটা পরে জেনেছিলাম। হ্যান্ডল ঝুলে থাকা একজন ছিনতাইকারী ভদ্রমহিলার গলার সোনার চেইনটি নিয়ে লাফ দেয়। ভদ্রমহিলা ঝিমুচ্ছিলেন। হঠাৎ দুহাত গলায় দিয়ে চিৎকার দেন, কোলের শিশুটিও ওই সময় মেঝেতে পড়ে কেদে ওঠে।

ভদ্রলোক দুই মেয়ে নিয়ে গেটেই ছিলেন। তিনি ভাবেন তাদেরই কেউ অন্য গেট থেকে বাচ্চাসহ পড়ে গেছেন আর কিছু না ভেবেই ঝাপিয়ে পড়েন।

একইভাবে বাবা ও বোনের জন্য অন্য দুটো মেয়েও একে একে ঝাপ দেয়। সব কিছুই ঘটে গেল নিমিষের মধ্যে কিছু বুঝে ওঠার আগেই।

তবে ট্রেনের গতি কম থাকায় সে যাত্রায় প্রাণগুলো বেচে গিয়েছিল।

বড়বাজার, মেহেরপুর থেকে

শাহবাজপুরে

- ভোলা নাথ পোদ্দার

রেলে যাবো সিলেট। রাত দশটায় *ইন্টারসিটি* ট্রেন। ভ্রমন সহযাত্রী ঢাকার বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিকের কয়েকজন রিপোর্টার। সবার মাঝে হৃদ্যতা অপরিসীম। সিলেট ভ্রমণের উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু নয়, জাতীয় দৈনিকটির একজন বিভাগীয় সম্পাদকের বোনের বিয়ে। একটু লেখালেখির সুবাদে এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আন্তরিকতা গড়ে ওঠা আমার ভ্রমণে যাওয়ার মূল কারণ।

ফার্স্ট ক্লাসের বগি। লোকজন কম। যদিও দুই একজন যাত্রী বগিতে ঢুকছে, অন্যের মনঃসংযোগ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে নিজের জায়গা খুজে নিচ্ছে। আমরা পারলে কাউকে সাহায্য করছি।

চোখে পড়লো বিক্ষিপ্তভাবে এখানে-সেখানে বসে আছে কয়েকজন মানুষ, যাদের পোশাকে কোনো সামঞ্জস্যতা নেই। অর্থৎ লোকগুলো লুঙ্গি এবং জামা পরা। যাত্রীদের সমাগম হওয়ায় ওরা কেটে পড়লো। ফেরিওয়ালাদের যেন হাট বসালো। ওরা ঝাক বেধে বগিতে ঢুকছে আর যাচ্ছে। কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। রাতের ট্রেনে যেমন নিরাপত্তা রক্ষী থাকার কথা তেমনটিও চোখে পড়লো না।

অবশেষে ট্রেন সিলেটের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো। সবাই মিলে গল্পে মেতে উঠলাম। মাঝে মধ্যে চললো এটা-ওটা খাওয়ার পর্ব। বেশ গরমের স্পর্শ। এক ভাবী তার আদরের লোকটিকে নিয়ে জানালার পাশে বসলেন।

দেখতে দেখতে রাত গভীর হতে থাকলো। বাইরে অন্ধকার আকাশ। বাতাসের সঙ্গে বাইরের অন্ধকার ভেতরে ঢুকতে থাকলো। হাতের ঘড়িতে রাত দুটো। সবাই যার যার সিটে হেলান দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। বগিতে লাইট অফ করে ঘুমানোর পরিবেশ সৃষ্টি করা হলো। মাঝে মধ্যে বেজে উঠছে মোবাইল। সিলেট থেকে খবর দিচ্ছে, আমরা কতো দূরে আছি।

হঠাৎ বিকট শব্দে কেপে উঠলো ট্রেন। এক ভাবীর আর্তনাদ।

সবাই লাফিয়ে উঠলাম।

ভাবী শুধু চিৎকার করছিলেন, আমার সব নিয়ে গেল।

বগিতে জ্বলে উঠলো আলো। ভাবী তার স্বামীর হাতের মধ্যে থেকেও ভয়ে কাপছিলেন।

জানালা দিয়ে কে যেন আমার সব নিয়ে গেছে।

একদিকে বিয়ের অনুষ্ঠান, অন্যদিকে ভাবীর আপনজনদের বাসায় বেড়ানোর আমন্ত্রণ আগ্রহ জমিয়েছিল কিছু সোনার অলংকার সঙ্গে আনার জন্য।

বারো হাজার নগদ টাকা এবং দশ ভরি স্বর্ণের অলংকার ছিল ছোট্ট একটি হ্যান্ডব্যাগে। অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে ব্যাগটি সব সময় রাখা হতো হাতে। দুর্বৃত্তরা কিভাবে বুঝতে পেরেছে ওই ছোট্ট ব্যাগটিতে রয়েছে ভাবীর সর্বস্ব তা ওরাই জানে! আমরা দেখলাম ভাবী কাপছেন আর বলছেন, ওরা মানুষ না। ছায়ার মতো এসে ওরা ছো মেরে আমার কোলের ওপর থেকে ব্যাগটি নিয়ে গেছে।

রেল পুলিশদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম জায়গাটির নাম শাহবাজপুর। দিন হলে মন পুরিয়ে দেখতে পারতাম স্মৃতিজড়িত শাহবাজপুরকে। রাতের অন্ধকার শাহবাজপুরকে আমাদের কাছে অন্ধকার করে রাখলো।

রেল পুলিশরা জানালো, শাহবাজপুর জায়গাটি ভালো না, বিক্ষিপ্ত ছোটখাটো অপরাধ মাঝে মধ্যে ঘটে থাকে। কিন্তু এতো বড় ঘটনা কখনো ঘটেনি। আমরা সাংবাদিক জেনে রেল পুলিশরা অনেক আশ্বাস দিল, অনেক তথ্যাদি লিখে রাখলো। আমরা জানি এসব নিষ্ফল সান্ত্বনা। আমরা জানি আমাদের সামাজিক অবস্থা এমন নয় যে, রেল পুলিশরা আমাদের জন্য আর কোনো চেষ্টা করবে বা ঘটনা উদঘাটনে তৎপর হবে। পারলে তারা অপরাধীদের কাছে থেকে উপঢৌকন নিয়ে তাদের উৎসাহিত করবে।

সিলেট শহরে রটে গেছে রিপোর্টারদের ট্রেন থেকে হাইজ্যাক হয়ে গেছে।

অবশেষে উৎকণ্ঠার রেল ভ্রমণের সমাপ্তি ঘটলো। আমরা ভোর ছয়টায় সিলেট পৌছালাম। সিলেটে উঠলাম *হোটেল গুলশান*–এ।

কিন্তু সেখানেও একই দৃশ্য, ভাবী মাঝে মধ্যে কেপে উঠছেন এবং বলছেন জিন এসেছিল। আমার সব নিয়ে গেছে।

তারপর দীর্ঘ দিন কেটে গেছে, এখনো ভাবীর খোজ রাখি। ভাই বলেন, ভাবী এখনো ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে ওঠেন এবং বলেন আসলে সেদিন জিন এসেছিল, না মানুষ এসেছিল!

মিরপুর, ঢাকা থেকে

চেইন

- ফরহাদ হোসেন

আমি ঢাকায় থাকি। মাঝে মধ্যে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমাকে সিলেট যেতে হয়। বেশির ভাগই ট্রেনে যাওয়া হয়। তাই ট্রেন ভ্রমণ নিয়ে আমার জীবনে অনেক ঘটনাই আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি শোনা ঘটনা এবং একটি আমার নিজের ঘটনার কথা আজ লিখবো।

এক.

একবার মামুন ভূইয়া নামের এক ভদ্রলোক আমার যাত্রাপথের সঙ্গী হন। কথা প্রসঙ্গে তিনি অনেক কথা বলেছিলেন। তার জবানিতেই শুনুন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার আজমপুরে আমার বাড়ি।

একদিন গভীর রাতে প্রচণ্ড জোরে শব্দ শুনলাম। বাড়ি থেকে বের হয়ে দেখলাম সিলেট থেকে চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম থেকে সিলেট যাওয়ার দুটি আন্তঃনগর এক্সপ্রেসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। বহু লোক সেখানে মারা

গেছে। আমরা তাদের উদ্ধার করার জন্য সেখানে ছুটে যাই। দেখতে পাই সেখানকার মাটির সবুজ ঘাস মানুষের রক্তে লাল হয়ে গেছে।

দেখলাম আমার পাশে একটি মৃত দেহ পড়ে আছে এবং মৃত দেহের পকেটে মোবাইল ফোনে রিং হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মোবইল ফোনটি বের করে রিসিভ করলাম। ওপ্রান্ত থেকে একটি নারী কণ্ঠ ভেসে এলো।

এতোক্ষণ লাগে ফোন রিসিভ করতে? ঘুমাচ্ছিলে নাকি? শোনো, তুমি পৌছে আমাকে ফোন করবে। হ্যালো হ্যালো, হ্যালো, কথা বলছো না কেন? শুনতে পাচ্ছ না?

হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো সে করেই যাচ্ছিল ওই প্রান্ত থেকে।

সকালবেলা আসবে বলেই মোবাইল ফোনটা বন্ধ করে রাখলাম। পরের দিন সকালে তারা এসে ওই ব্যক্তির লাশ নিয়ে চলে যায়।

মি. মামুনের কথা শুনতে শুনতে কখন যে চোখের ফোটা ফোটা পানিতে হাতে ধরে রাখা খবরের কাগজটি ভিজে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি।

দুই.

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। ২০০৪–এর মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে সিলেট যাওয়ার উদ্দেশ্যে জয়েন্তিকা আন্তঃনগর এক্সপ্রেস–এ টিকেট কাটলাম কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে।

যথাসময়ে কমলাপুর রেলস্টেশনে পৌছাই।

আমার ট্রেন ছাড়ার সময় ছিল দেড়টা। কিন্তু কোনো কারণবশত কর্তৃপক্ষ ট্রেনটি যথাসময় থেকে এক ঘণ্টা পিছিয়ে আড়াইটায় ছাড়ার ঘোষণা দিল। চিন্তা করলাম এতোক্ষণ সময় আর কোথায় কাটাই, বরং স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে কিছুটা সময় গল্প করি।

স্টেশন মাস্টার একেএম শামসুল হক খুব ব্যস্ত থাকার মাঝেও আমাকে সময় দিলেন। তিনি নম্র, ভদ্র, মিশুক এবং সহজ–সরল মনের অধিকারী। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলার এক পর্যায়ে দুঃখ করে বললেন, স্টেশনমাস্টার হয়েও আমাকে ট্রেনের ভেতর ডাকাতের হাতে সব কিছু খোয়াতে হয়েছে।

বিষয়টি আমার বিস্তারিত জানার আগ্রহ দেখে তিনি বললেন, প্রায় দুই আড়াই মাস আগের কথা। রেল সংক্রান্ত কাজে এয়ারপোর্ট রেলস্টেশনে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে একটি শাটল ট্রেনে কমলাপুর রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। শাটল ট্রেনে সাধারণত যাত্রী কমই থাকে। এবং আমি যে বগিতে বসেছি সেই বগিতে আর কোনো যাত্রী ছিল না।

ট্রেন তেজগাও আসার পর দেখলাম ট্রেনের ছাদের ওপর থেকে ষোল সতেরো বছর বয়সী চার পাচজন ছেলে ট্রেনের জানালা দিয়ে বগির ভেতরে ঢুকছে।

খুব জোরে বললাম, এই, তোমরা কারা? এভাবে ভেতরে ঢুকছো কেন?

তারা বললো, আংকল, উপরে খুব ঠাণ্ডা লাগছে, তাই ভেতরে ঢুকছি।

আমি আর তেমন কিছু বললাম না।

কয়েক মিনিট পর ওরা পেছন থেকে একটা গামছা দিয়ে আমার গলার মধ্যে ফাস দিল এবং গামছার দুই মাথা ধরে দুজনে টানা শুরু করলো। আমার জিভ প্রায় বের হয়ে যায় যায় অবস্থা। তখন একজন আমার পকেট হাতিয়ে চার হাজার টাকা বের করে নিল।

ইতিমধ্যে ট্রেন যখন কমলাপুর রেলস্টেশনের প্রায় কাছে চলে এলো। ট্রেন স্লো হলো। তখন তারা গামছা রেখে লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল।

মি. শামসুল হক বললেন, সেদিন আমার অর্থ কষ্টের চেয়ে শারীরিক কষ্টই বেশি হয়েছিল।

তিন.

সেদিন স্টেশনমাস্টার শামসুল হক চার হাজার টাকার বিনিময়ে যেমন একটি গামছা পেয়েছিলেন, আমিও তেমন অন্য আরেক ভদ্রলোকের পাচ হাজার টাকা দামের একটি মোবাইল সেটের বিনিময়ে নিজের কৌতূহল মিটিয়েছিলাম।

জানি না আমার এই গল্পটি সেই ভদ্রলোকের চোখে পড়বে কি না। যদি পড়ে তাহলে তিনি আমার চোদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করে ছাড়বেন।

সোজা প্ল্যাটফর্মে এসে ট্রেনে উঠলাম। নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর আমার পাশের সিটে এক ভদ্রলোক বসলেন। তার সিটটি ছিল জানালার পাশে।

ট্রেন সার্ভিস সম্পর্কে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে কিছু কথা আগে বলে নেয়া প্রয়োজন। ট্রেনে অ্যাটেনডেন্ট থাকেন। যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা দেখে সব কিছু ম্যানেজ করা তাদের কাজ। টিটিরা থাকেন টিকেট পরীক্ষা করার জন্য। যাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তারও থাকেন। ড্রাইভার, গার্ড তো থাকেনই।

ট্রেনের ভেতরে মানুষের সবচেয়ে বেশি কৌতূহল হয় চেইন টানার বিষয়ে। এই চেইন টানলে ট্রেন বন্ধ হয়ে যায়। চেইন টানার ওখানে লেখা থাকে, *অকারণে চেইন টানলে দুইশ টাকা জরিমানা হবে*।

চেইন টানতে হয় যখন ট্রেনে ডাকাত পড়ে, কোনো যাত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে, কোনো বড় রকম চোরাচালান ধরা পড়লে অথবা কোনো মহিলা যাত্রীর ওপর অত্যাচার হলে। মোট কথা, মেজর কোনো প্রবলেম না হলে চেইন টানা দণ্ডনীয় অপরাধ।

এছাড়া প্রতিটা বগির শেষ মাথায় বাইরের পাশে একটা বাটি মতো থাকে। সেটা বাথরুম থেকে হাত বাড়িয়ে মোচড় দিলে বগির হাওয়া বের হয়ে যায় এবং ট্রেন ধীর ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

এটা সাধারণত সন্ত্রাসী, চোরাচালানকারী আর সাধারণত যে যাত্রীর বাড়ির পাশ দিয়ে ট্রেন যায় তারাই এ কাজটি করে থাকে। কেননা ট্রেন স্লো হয়ে গেলেই তারা লাফ দেয়। সরাসরি তারা চেইন টানে না। কারণ চেইন টানলে ওই বগির সকল যাত্রীই দেখে ফেলতে পারে তাকে।

যাই হোক। আমি এবার আমার গল্পে আসি। পাশে যে যাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হলো তার নাম জসীমউদ্দিন। বাড়ি নোয়াখালি। সিলেট যাচ্ছেন অফিসের কাজে।

এক সময় দেখি মি. জসীম পকেট থেকে একটা নকিয়া মোবাইল সেট বের করে জানালার ওপর হাত নিয়ে এক মনে *স্পেস ইমপ্যাক্ট* নামে একটি গেমস খেলছেন।

এই দৃশ্য দেখে আমার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি এলো। চিন্তা করলাম তার হাতে যদি সামান্য আঘাত করা যায় তাহলে মোবাইল সেটটি নিচে পড়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের চেইন টানবো। ট্রেন চলা বন্ধ হয়ে যাবে। আমার বহু দিনের একটা কৌতূহল মিটবে।

আমার মতো অনেকেরই কৌতূহল আছে চেইন টানলে আসলেই কি হয় না হয়, তা দেখার। তাই ভাবলাম এই কৌতূহলের পিপাসা মেটাতে হলে এর চেয়ে আর ভালো সুযোগ পাওয়া যাবে না।

পরবর্তীকালে কি হবে, না হবে এসব না ভেবে টয়লেটে যাওয়ার জন্য ঘুম ঘুম চোখ নিয়ে সিট থেকে উঠে দাড়ালাম। যারা ট্রেনে উঠেছেন তারাই জানেন যে, চলন্ত ট্রেনে দাড়ালে কিংবা হাটলে শরীর ঢলে পড়ে যেন শরীরে অ্যালকোহলের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

তাই পাশের যাত্রীর ওপর ট্রেনের তালে তালে এমনভাবে ঢুলে পড়লাম যে, তার মোবাইল তো ছিটকে পড়েছে, সঙ্গে চোখের চশমাটা পর্যন্ত পড়ে যাচ্ছিল। একটুর জন্য চশমাটা আমার হাতে ধরা পড়লো।

ভদ্রলোক একবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন আরেকবার জানালা দিয়ে পেছনের দিকে তাকাচ্ছেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে চেইন ধরে দিলাম টান। মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনের গতি কমে গেল। ট্রেন ধীরে ধীরে স্লো হচ্ছে। ট্রেন দাড়াতে দাড়াতে প্রায় আধা কিলোমিটার গড়িয়ে গেল।

তখনো ভদ্রলোক কিছু বলছেন না।

আমি গেটের কাছে দাড়িয়ে নিজেকে হিরো মনে করছি। কারণ এই লম্বা ট্রেন আমাকে কেন্দ্র করে বন্ধ হয়েছে। ঘটনা এতো দ্রুত গতিতে গড়াচ্ছিল যে, ভদ্রলোকের মুখে কোনো কথা আসছিল না।

শুধু বললাম, চিন্তা করবেন না, সেটটি খুজে নিয়ে আসছি।

বলেই ট্রেন থেকে নেমে পেছন থেকে দৌড়াতে থাকলাম। প্রায় এক কিলোমিটার খুজলাম। কিন্তু মোবাইল সেটটি পেলাম না।

তখন প্রায় বিকেল। রেললাইনের আশপাশেও কিছু ছেলেদের দেখলাম। জায়গাটা ছিল শ্রীমঙ্গল স্টেশনের কাছে। ভাবলাম মোবাইল সেটটি হয়তো কেউ নিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম সেটটি পাবো। কিন্তু পেলাম না। আর পাবোই বা কি করে!

রেললাইন দিয়ে জনসাধারণের চলাচল কিংবা রেললাইনের পাশে দাড়িয়ে থাকা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তারপরও আমাদের দেশের জনসাধারণ রেললাইন দিয়ে চলাচল করে, এমনকি ছোট ছোট ছেলেরা ট্রেন যাওয়ার সময় ঢিল ছোড়ে এবং ট্রেন আসার আগে রেললাইনে পাটির ওপর পয়সা রেখে চ্যাপ্টা করে খেলানা বানায়।

হঠাৎ দূর থেকে আওয়াজ ভেসে এলো, কি ভাই, পেয়েছেন?

কাছে গিয়ে বললাম, না ভাই, পেলাম না। সত্যিই আমি সরি।

ভদ্রতার খাতিরে আরো বললাম, সিলেট নেমেই আপনার সেট কিনে দেবো।

ভদ্রলোক বললেন, না, না। আপনি তো আর ইচ্ছা করে করেননি। বাই চান্স হয়ে গেছে।

মনে মনে তাকে ধন্যবাদ জানালাম। কারণ সিলেট নেমে তাকে মোবাইল সেট কিনে দেয়ার মতো টাকা আমার পকেটে ছিল না।

যাই হোক। কথা বলতে বলতে দুজনে সিটে গিয়ে বসলাম। টিটি এসে সব কিছু শুনলেন। তারপর আবার ট্রেন চলা শুরু হলো। আমার কৌতূহল মিটলেও কোনোভাবেই ওই ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল।

মোবাইল ফোন কেনা ও ব্যবহারের সামর্থ এখনো আমার হয়নি। তবে সেদিন চলন্ত ট্রেনে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যেদিন মোবাইল ব্যবহার করার মতো সামর্থ আমার হবে সেদিন ওই ভদ্রলোককে আমার মোবাইল ফোনটি দিয়ে ঘটনাটি খুলে বলবো। সব শোনার পর যদি তিনি আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে কোনো একদিন সিলেট যাওয়ার পথে ঠিক সেখানেই আমার মোবাইল ফোন সেটটি ফেলে দিয়ে যাবো। কিছুটা হলেও পাপ থেকে রেহাই হয়তো পাবো।

লালবাগ, ঢাকা থেকে
farhadhbd@yahoo.com

অলৌকিক

- আবু- আল- আলম

১৯৭৮ সাল। আমি তখন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্বাহী প্রকৌশলী। আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী ও এক বছরের কন্যা সন্তান ছাড়াও হুমায়ূন নামের এক ছোট ভাই থাকতো। ও তখন একটি বিদেশি ওষুধ কম্পানিতে মেডিকাল রিপ্রেজেনটেটিভ–এর চাকরি করতো। তখন প্রায় প্রত্যেক ঈদেই বাড়ি আসতাম। সে বছরও রোজার ঈদে বাড়ি আসার প্ল্যান করলাম।

বাড়ি পাবনা শহরে। তখন সড়কপথে এখনকার মতো যাতায়াতের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র ভালো ব্যবস্থা ছিল *রাজশাহী এক্সপ্রেস* নামের ট্রেন যা প্রতিদিন বেলা তিনটায় চট্টগ্রাম থেকে ছাড়তো।

আমরা ঈদের দুই দিন আগের ফার্স্ট ক্লাসের তিনটা বার্থ রিজার্ভ করলাম। কিন্তু চট্টগ্রামের বটতলী স্টেশনে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। ট্রেনে ওঠার কোনো উপায় নেই। ট্রেনের ভেতরেও লোক গিজ গিজ করছে। উপায়ান্তর না দেখে গার্ডের শরণাপন্ন হলাম।

গার্ড ট্রেনে উঠে রিজার্ভেশনের চার বার্থের চারজনের বসার জন্য একটি বার্থ থেকে লোকজন সরিয়ে খালি করে দিলেন।

বহু কষ্টে কয়েকজন পরিচিত লোকের সহায়তায় মালপত্র ট্রেনে উঠিয়ে উপরের একটি বার্থ খালি করে মালপত্র সেখানে রাখলাম এবং নিচের বার্থে বসলাম। কিন্তু লোকের এতো ভিড় যে, পা টান করারও কোনো উপায় ছিল না। তাদের কথা শুনে বুঝলাম তারা প্রায় সবাই বিনা টিকেটের যাত্রী।

অবশ্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেতে যেতে কম্পার্টমেন্ট প্রায় খালি হয়ে গেল। এরপর সারা রাত নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। শেষ রাতে ময়মনসিংহে এসে সেহরি খেলাম এবং খুব সকালে ট্রেন জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে এসে পৌছালো।

জগন্নাথগঞ্জ ঘাট থেকে ফেরিতে যমুনা পাড়ি দিয়ে সিরাজগঞ্জ ঘাটে এসে ট্রেন ধরে ঈশ্বরদীতে যখন পৌছালাম তখন দুপুর। আমাদেরকে এখানে নেমে বাসে করে পাবনা যেতে হবে। ঈশ্বরদী থেকে পাবনার দূরত্ব ষোল মাইল।

কিন্তু ঈশ্বরদী স্টেশনে পৌছে দেখি সেখানেও মানুষের প্রচণ্ড ভিড়। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে কে কার আগে ট্রেনে উঠবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

গরমে আর লোকের ভিড়ে আমার বাচ্চা মেয়েটি ভীষণ কান্না জুড়ে দিল।

যাহোক, বহু কষ্টে লোকজনের ভিড় ঠেলে ট্রেন থেকে নেমে বাসে করে পাবনায় বাড়ি গিয়ে পৌছানোর পর আমার ভাই হুমায়ূন বললেন যে, মালপত্রের মধ্যে তার হাতব্যাগ. যে ধরনের ব্যাগ সাধারণত মেডিকাল রিপ্রেজেনটেটিভরা ব্যবহার করে থাকে, পাওয়া যাচ্ছে না।

সিরাজগঞ্জে ট্রেনে যে সিটে বসেছিলাম, ব্যাগটি তার নিচে রাখা ছিল।

সবাই নিশ্চিত হলাম যে, ঈশ্বরদীতে ট্রেন থেকে তাড়াহুড়ো করে নামার সময় ব্যাগটি ভুল করে ট্রেনেই ফেলে আসা হয়েছে। ব্যাগের মধ্যে আমার ভাইয়ের কয়েক হাজার টাকা, অফিসের কিছু মূল্যবান কাগজপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসহ একটি ডায়রি ছিল। ওই সমস্ত মূল্যবান কাগজপত্র ও ডায়রি খোয়া গেলে চাকরির সমস্যা হতে পারে ভেবে আমার ভাই খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

এদিকে ট্রেনটি ঈশ্বরদী থেকে রাজশাহী হয়ে চাপাইনবাবগঞ্জ যাবে।

ট্রেনটি রাজশাহী গিয়ে ধরা যায় কি না এই ক্ষীণ আশা নিয়ে আমি ও খসরু নামের আমার এক ভাই মোটর সাইকেল নিয়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে ছুটলাম। সেদিন ছিল ঈদের আগের দিন। পথিমধ্যে ইফতার সেরে আমরা যখন রাজশাহী রেলস্টেশনে পৌছালাম তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে কিছুটা রাত হয়েছে।

এএসএম (অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন মাস্টার)–এর রুমের সামনে গিয়ে ভেতরে এএসএম হিসেবে যাকে দেখলাম তাকে দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। বড় গোফওয়ালা অল্প বয়সী এক ছেলে। ষণ্ডামার্কা চেহারা। তবু সাহস সঞ্চয় করে তার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললাম।

তিনি আমাদের সঙ্গে খুব আন্তরিকভাবে কথা বললেন এবং জানালেন যে, কিছুক্ষণ আগে পাবনা থেকে এ ব্যাপারে একজন তাকে টেলিফোন করেছিলেন।

নাম শুনে বুঝলাম তিনি আমার বড় ভাই। তবে ততোক্ষণে ট্রেন রাজশাহী ছেড়ে চাপাইনবাবগঞ্জের দিকে চলে গেছে।

এএসএম–এর সঙ্গে আলাপ করে জানলাম তার বাড়ি ঈশ্বরদীতে। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। শুধু কারোর বাইরের চেহার দেখেই যে তাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না, আমাদের প্রতি তার আচরণ দিয়ে তিনি সেটাই প্রমাণ করলেন।

যাহোক, এএসএম আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন আমরা সিরাজগঞ্জ ঘাটে ট্রেনের কোন বগিতে উঠেছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন রাজশাহী স্টেশনে ফিরে এলো। এএসএম সোজা ওই বগিতে গিয়ে অ্যাটেনডেন্টকে ব্যাগটা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সরাসরি নির্দেশ দিলেন।

অ্যাটেনডেন্ট উপায়ান্তর না দেখে লুকানো স্থান থেকে ব্যাগটা বের করে দিল।

এএসএম ব্যাগের জিনিসপত্র ঠিকমতো আছে কি না দেখতে বলে চলে গেলেন।

আমরা ব্যাগে সব কিছু ঠিকঠাক মতো পেয়ে অ্যাটেনডেন্টকে কিছু টাকা বকশিশ দিয়ে এএসএম–কে ধন্যবাদ জানাতে গেলাম।

আমরা ঠিক করেছিলাম, আমরা যেভাবে মোটর সাইকেলে রাজশাহী গিয়েছি, ফিরবোও ওইভাবে মোটর সাইকেলে।

কিন্তু এএসএম আমাদেরকে ঈদের আগের রাতে ওইভাবে এতো রাস্তা মোটর সাইকেলে যেতে নিষেধ করলেন। তিনি আমাদের মোটর সাইকেল ট্রেনের একটি লাগেজ ভ্যানে উঠিয়ে দিয়ে ঈশ্বরদী হয়ে পাবনা যেতে বললেন।

আমরা যখন ওইভাবে বাড়িতে পৌছালাম তখন রাত বারোটা। ট্রেনে হারানো ব্যাগটা কি করে ফেরত পেলাম সেটা এখনো আমার কাছে অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হয়।

শ্যামলী, ঢাকা থেকে

একাত্তরে

- চৌধুরী সাইফুল আলম

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। আমি তখন কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে। আমাদের কিশোরগঞ্জ শহর হানাদার পাকবাহিনী কবলিত হওয়ায় আমরা তখন গ্রামের বাড়িতে।

একদিন বিশেষ পারিবারিক কাজে আমার ঢাকা যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নিরাপত্তার প্রয়োজনে কিশোরগঞ্জ থেকে চার স্টেশন দূরে আঠারোবাড়ি স্টেশন থেকে ঢাকাগামী ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে সেখানে এক ফুপুর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

স্টেশনে খোজ নিয়ে জানতে পারলাম, ভৈরব থেকে ময়মনসিংহ হয়ে তখন একটি মাত্র ঢাকাগামী ট্রেন দুই তিনি দিন অন্তর চলাচল করে। তবে সে ট্রেনেরও নির্দিষ্ট সময়সূচি নেই।

দুই দিন ফুপুর বাড়িতে অপেক্ষার পর তৃতীয় দিন দুপুরের দিকে খবর পেলাম, সেদিন বিকেলের দিকে ট্রেন আসতে পারে। তখন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে স্টেশনে গিয়ে বসে রইলাম।

বিকাল পাচটার দিকে এলো সেই প্রতীক্ষিত ট্রেন। তবে ট্রেনের ছয়টি বগির মধ্যে তিনটিই মিলিটারির দখলে। তাড়াতাড়ি একটা কম্পার্টমেন্টে উঠে লম্বা সিটের এক প্রান্তে বসে ফিরে দেখি আমার পাশে ষোল সতেরো বছরের একটি মেয়ে বসে পড়লো। তার সঙ্গে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো কম্পার্টমেন্ট যাত্রীতে ভরে গেল।

প্রায় পনেরো মিনিট পর ট্রেনের হুইসল শুনে ভাবলাম, যাক, ট্রেন তাহলে ছাড়লো। কিন্তু দেখা গেল, ট্রেন রেখে শুধু ইঞ্জিন ছুটে যাচ্ছে।

তখন একজন যাত্রী বললো, ইঞ্জিন সামনের স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে আবার পেছনে ফিরে এসে এ ট্রেন টেনে নিয়ে যাবে, নিরাপত্তার কারণে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এখন এভাবেই ট্রেন চলাচল করে।

নীরবে বসে রইলাম। হঠাৎ পাশের মেয়েটি বৃদ্ধ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলো, নানা, পানির ফ্লাস্কটি কোথায়?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, ওহ হো, আনতে ভুলে গেছি।

আমার খুব পিপাসা লেগেছে।

আচ্ছা, আমি দেখছি। বলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠে গিয়ে পানিওয়ালার খোজ করতে লাগলেন।

তখন ব্যাগ থেকে আমার পানির বোতলটা বের করে মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিলে সে খানিকটা দ্বিধাজড়িত হাতে ধরলো। পানি পান শেষে লাজুক মুখে ফিরিয়ে দিল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।

তখন পাশের কম্পার্টমেন্টে কোলাহল শুনে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, কয়েকজন মিলিটারি চারজন যুবককে ট্রেন থেকে নামিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

অল্পক্ষণ পর দরজার কাছে বুটের আওয়াজ পেয়ে দেখি পাচ ছয়জন মিলিটারি আমাদের কম্পার্টমেন্টে এসে উঠলো।

বুকটা তখন ধক করে উঠলো।

তরুণ অফিসার টাইপের একজন এগিয়ে এসে আমার সামনের সিটের বাইশ তেইশ বছরের একজন যুবককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, *তুম কাহা যায়ে গা ?*

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললো, ময়মনসিংহ।

তোমাহারা সাথ মে কোই হ্যায় ?

ছেলেটি মাথা নাড়লো।

ডান্টি কার্ড হ্যায় ?

ছেলেটি আবারও মাথা নাড়লো।

তখন সে ইশারা করতেই পাশের একজন সৈন্য ছেলেটির হাত ধরে টেনে নিচে নিয়ে গেল।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তরুণ অফিসারটি জিজ্ঞাসা করলো, *তুম কাহা যায়ে গা ?*

বললাম, ঢাকা।

তোমহারা সাথ মে কোই হ্যায় ?

আমার পাশের মেয়েটি তখন চট করে তার দিকে তাকিয়ে বললো, ভাইয়া, এ আমার ভাই। আমরা ঢাকায় যাচ্ছি।

অফিসারটি তখন বললো, *ঠিক হ্যায় বইঠো।*

তারপর আমারই সমবয়সী আরেকটি ছেলেকে একই ধরনের প্রশ্ন করে ধরে নিয়ে গেল।

মিলিটারিরা চলে যাওয়ার পর মেয়েটিকে বললাম, তুমি আমাকে বাচালে।

মেয়েটি বিষণ্ন কণ্ঠে বললো, ওই দুজনকেও যদি বাচাতে পারতাম! আল্লাহ জানে, তাদের ভাগ্যে কি আছে!

হঠাৎ ইঞ্জিন এসে লাগার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পর ট্রেন চলতে শুরু করলো।

পরবর্তী স্টেশনে এসে আবারও ট্রেন রেখে ইঞ্জিন সামনের স্টেশনের দিকে ছুটে গেল। এভাবে এক একটি স্টেশন পেরোতে প্রায় তিনগুণ সময় লাগছিল।

ইতিমধ্যে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, তার নাম লায়লা। ক্লাস টেনের ছাত্রী। স্থানীয় রাজাকার বাহিনীর তৎপরতায় শংকিত হয়ে ঢাকায় চাচার বাসায় চলে যাচ্ছে।

রাত এগারোটার দিকে দেখি অধিকাংশ যাত্রী ঘুমে ঢুলু ঢুলু। আমার তখন ক্ষিধে লাগায় ব্যাগ খুলে দেখি একটা ছোট মাটির হাড়িতে ফুপু অনেকগুলো পিঠা ভরে দিয়েছেন।

পিঠা খেতে খেতে হাড়িটা মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিলে সে একটা তুলে নিয়ে বললো, আমাদের সঙ্গে তো খাবার রয়েছে।

ট্রেন গৌরীপুর থেকে ছাড়তেই হঠাৎ বাতি নিভে গেল। এতোক্ষণে মেয়েটি ঘুমে জড়িয়ে পড়লো। তার মাথা বার বার এদিক-ওদিক হেলে পড়ছিল। এক সময় আমার কাধে মাথা রেখে মেয়েটি ঘুমাতে লাগলো।

এক হাতে তার মাথাটি ধরে রাখলাম যাতে একটু আরামে ঘুমাতে পারে। এভাবে কখন যে নিজেও ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না।

অনেকক্ষণ পর জেগে দেখি মেয়েটি এক হাতে আমার পিঠ বেষ্টন করে আমার বুকে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ধীরে ধীরে ভোরের আরো ফুটে উঠলো। মেয়েটি হঠাৎ জেগে ওঠে লজ্জিত হয়ে সিটে হেলান দিয়ে ঘুমুতে লাগলো।

সকাল দশটার দিকে ট্রেন ঢাকায় এসে পৌছালো। নামার আগে মেয়েটিকে আমার ঠিকানা দিয়ে বললাম, তোমার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে থাকবে। যদি কখনো প্রয়োজন হয় আমায় লিখো। আশা করি আবার দেখা হবে।

কিন্তু আর দেখা হয়নি।

তেজগাও, ঢাকা থেকে

বাসর

- উজ্জ্বল

সেদিনটি ছিল ১৯৯৫ সালের ৫ নভেম্বর। আমার ভালোবাসার মুক্তিকে সবার অজান্তে গোপনে বিয়ে করেছিলাম।

মিঠু অ্যাডভোকেট এবং আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু শহিদুল্লাহর সহযোগিতায় টাংগাইল পূর্ব আদালতপাড়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসারের বাসায় সকাল দশটার মধ্যে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়।

পরিবারের অমতে বিয়ে করা অন্যায় তা জানা সত্ত্বেও সেই অন্যায়টি করেছিলাম। কারণ ভালোবাসা এমনই এক অনুভূতি যা অন্যায়কেও অস্বীকার করে।

ভালোবাসার সংজ্ঞা আপনারা সবাই জানেন। আমি শুধু বলবো, ভালোবাসা আছে বলেই পৃথিবী এতো সুন্দর, ভালোবাসা আছে বলেই পৃথিবীর মানুষ এতো সুন্দর। ভালোবাসা জাত-কুল, ধনী-গরিব দেখে হয় না। ভালোবাসা হচ্ছে আত্মার স্পন্দন। ইচ্ছা করলেই ভালোবাসা পাওয়া যায় না। *দুটি দেহের এবং আত্মার সম্পর্কের নামই হচ্ছে ভালোবাসা*। এ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং আল্লাহতাআলাই। তাই এ সম্পর্ক কেউ খণ্ডাতে পারে না।

আমাদের পরিবারের কেউ পারেনি মুক্তিকে আমার হৃদয় থেকে আলাদা করতে। কারণ মুক্তি আমার ভালোবাসা, আমার প্রেম, আমার জীবনসঙ্গী, আমার স্ত্রী, আমার রানী।

বিয়ের কাজ তো সম্পন্ন হলো। এখন যাবো কোথায়!

শহিদুল্লাহ বললো, আজই তোমরা আমাদের গ্রামের বাড়ি ধামরাইতে চলে যাও। দেরি করো না, ওখানেই হবে তোমাদের বাসর রাত, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মুক্তি আমাকে বললো, না, তা হয় না, চলো আমরা বাসায় ফিরে যাই। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে তো পারিবারিক সুসম্পর্ক আছেই। আস্তে আস্তে সবাই এক সময় এটা মেনে নেবেনই। তখনই হবে আমাদের বাসর ঘর।

মুক্তির কথা মেনে নিয়ে বাসায় চলে এলাম।

চট্টগ্রাম নৌবাহিনীর আবাসিক সেনানিবাসে মুক্তির মেজ বোন থাকেন। স্বামী নৌবাহিনীর বড় অফিসার, চার মেয়ে নিয়ে তাদের সুখের সংসার। তাদের মেজ মেয়ে কনার জন্মদিনের নিমন্ত্রণে মুক্তিদের পরিবারের সবাই যাচ্ছে।

মুক্তি আমাকে বললো, তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। আমি বড় ভাবীকে আমাদের সম্পর্কের কথা সব বলেছি। চট্টগ্রামেই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বাসর।

বললাম, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম কিভাবে যাবে। বাসে, না ট্রেনে?

ট্রেনে।

তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ ট্রেন ভ্রমণ আমার খুবই ভালো লাগে।

সময় মতো এবং নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌছানোর একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ট্রেন। রাতে ট্রেন ভ্রমণ আমার বেশি প্রিয়। চারদিক থাকে জনশূন্য, বাইরে গাছপালা, গ্রাম–বন্দর থাকে অন্ধকারে ঢাকা। মনে হয় স্বপ্নপুরীর অন্ধকারে বন–জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

তূর্ণা নিশীথা ট্রেন ঢাকা থেকে রাত দশটায় রওনা হই চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। মুক্তিদের পরিবারের সঙ্গে যথাসময়ই আমরা কমলাপুর রেলস্টেশনে পৌছালাম। মুক্তির বড় ভাই, ভাবী, বড় বোন, স্বামী এবং তাদের ছেলেমেয়ে ও আমিসহ মোট দশজন যাত্রী হলাম। তাই বড় ভাইয়া ট্রেনের একটি বিশাল বগির টিকেট কাটলেন। আর আমি একটি সিংগল বগির টিকেট কাটলাম ঠিক তাদের বড় বগিটির পাশে।

তারপর আমরা যথাসময়ই ট্রেনে উঠে পড়লাম এবং আমার সিংগল বগিতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রেখে তাদের বগিতে চলে গেলাম জমিয়ে আড্ডা দেয়ার জন্য।

তাদের বগিটি অনেক বড়, চার পাশে চারটি ডাবল বেড, মাঝখানে অনেকটা ফাকা জায়গা। আমি বগিতে ঢুকতেই দেখি সবাই মাঝখানের ফাকা জায়গায় বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে আবার কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও তাদের মাঝে বসে পড়লাম। লুডু খেলে অনেকক্ষণ সময় কাটালাম।

ওয়েটার কিছুক্ষণের মধ্যেই চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে চিন্তা করলাম, কিভাবে মুক্তিকে আমার বগিতে নেয়া যায়! আমার ইচ্ছা এ টেনেই হবে আমাদের বাসর ঘর।

হঠাৎ বড় ভাইয়া ঘড়ি দেখলেন, রাত একটা বাজে। তিনি ঘুমাতে চলে গেলেন। বাকিরা সবাই ক্লান্ত হয়ে অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাবী, মুক্তি আর আমি ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে।

এই সময়ে ভাবী আমাকে বললেন, কি খবর ভাই? তলে তলে এতোদূর?

আমার আর কিছুই বুঝতে বাকি রইলো না। ভাবীর সহযোগিতায় মুক্তিকে নিয়ে আমার বগিতে চলে গেলাম।

আমার বগিটি ছিমছাম খুবই সুন্দর। একটি সিংগল বেড। এটাচড টয়লেট এবং একটি ছোট টেবিল।

বগির জানালার পাশে দাড়িয়ে আছে মুক্তি।

হাত ধরে আমার পাশে বসিয়ে বললাম, অনেক প্রতীক্ষার পর আজ তোমাকে একান্ত আপন করে পেয়েছি। আজ তোমাকে সারা রাত মন ভরে দেখবো। মুক্তি, আমার মুক্তি, তুমি কেমন আছো? আমায় পেয়ে কি তুমি সুখী?

মুক্তি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, তোমার ভালোবাসা পেয়ে সত্যিই আমি ধন্য।

টিয়া রঙের শাড়িতে মুক্তিকে খুবই সুন্দর লাগছিল। কপালে ছোট টিপ ও চোখে কাজল দিয়েছিল এবং ঠোটেতে লিপস্টিক মেখেছিল। কাছে গিয়ে তা ধরতেই দেখতে পেলাম মুক্তির ঠোট থর থর করে কাপছে।

নিবিড় সুখে, অনাবিল তৃপ্তিতে আমরা হারিয়ে গেলাম ঘুমের দেশে।

সকালে ট্রেন থেকে নামার পর পেছনে ফিরে তাকিয়ে ট্রেনের উদ্দেশ্যে বললাম, *তূর্ণা নিশীথা* তোমাকে ধন্যবাদ।

দক্ষিণ কোরিয়া থেকে

বাগেরহাট টু রূপসা

- মোহাম্মাদ হারুন- অর- রশিদ

ছোটবেলায় লেগাড়িতে চেপে বাগেরহাট থেকে খুলনা আসতাম মা এবং বড় ভাইদের সঙ্গে। তখনকার সময় বাগেরহাট থেকে রূপসা পর্যন্ত মানুষের চলাচল এবং যোগাযোগের প্রধান বাহন ছিল রেল। মাত্র বিশ-বাইশ মাইল এই রেলপথ অতিক্রম করতে রেলের সময় লাগতো দুই ঘণ্টা বা তারও অধিক। বিভিন্ন ধরনের মানুষ তাদের ব্যাগ, বেডিংপত্র, হাস-মুরগি, হাড়ি-পাতিল, কোদালকাস্তে ইত্যাদি বিচিত্র সব জিনিসপত্র নিয়ে প্রতিদিনই চাপাচাপি করে বাগেরহাট থেকে রূপসা, রূপসা থেকে বাগেরহাট চলাচল করতো। বাইশ তেইশ বছর আগে বাগেরহাট অঞ্চলের মানুষ খুব কষ্ট করে চলাফেরা করতো।

বাগেরহাট থেকে ট্রেন ছেড়ে কলেজ স্টেশন, যাত্রাপুর, মূলঘর, বাহিরদিয়া, সামান্তসেনা, কর্ণপুর হয়ে রূপসা আসতো। ট্রেনে এতো যাত্রী হতো মানুষের চাপাচাপি, গায়ের গন্ধ, হাস-মুরগির গন্ধ, বাচ্চাদের কান্নাকাটি, টয়লেটের বিকট গন্ধ, ছারপোকার কামড়, ফেরিওয়ালাদের চেচামেচি সব মিলিয়ে একটা অসহনীয় অবস্থা বাগেরহাট-রূপসার ট্রেনে সব সময় বিরাজ করতো। তারপরও আমরা বাধ্য থাকতাম ট্রেনে চড়তে। ট্রেন জার্নির সারাটা সময় বাদামওয়ালা, বুটওয়ালা, রুটি বিক্রেতা, শসা বিক্রেতা, ঝালমুড়িওয়ালা আরো অনেক ফেরিওয়ালা দাতের মাজন, কৃমির বড়ি, ধাতু পাতলার ওষুধ, মর্দামি শক্তি বাড়ানোর ওষুধ, মেহ-প্রমেহর ওষুধ, গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ, শ্রীপুরের লাল-কালো বড়ি, পুরুষাঙ্গ কিটকিট করার ওষুধ, খুজলি-পাচড়ার ওষুধ, মেয়েদের সুতিকা, বাদক ব্যাথা, শাদা স্রাবের ওষুধ, স্বপ্নের পাওয়া তাবিজ, খান জাহান আলী (রা.)-এর মাজারের তাবিজ, বিচিত্র ধরনের ক্যানভাসার এবং হরেক রকমের ভিক্ষুক সারাটা পথ ট্রেনটাকে এরা দখল করে রাখতো।

বাগেরহাট টু রূপসা বা রূপসা টু বাগেরহাট ছোটবেলার এই ট্রেন জার্নিতে রেলগাড়ি ঝমাঝম, চলন্ত ট্রেনে পেছনে ফেলে আসা ঘরবাড়ি, সামনে রেললাইনের দুপাশে বিস্তীর্ণ মাঠ, ধানের ক্ষেত, সবজির ক্ষেত, রাখাল ছেলের গরু নিয়ে যাওয়া, দুপাশে চলে যাওয়া মেঠো পথ, ট্রেনের হুইসল আমার ওপর তেমন প্রভাব পরতো না। অসহনীয় এই জার্নিতে ভালো লাগার অনুভূতি ছিল খুবই কম।

ভিক্ষুকের মধ্যে এমন একজন ছিল যে ট্রেনযাত্রীদের কিছু সময়ের জন্য হলেও সম্মোহন করতে পারতো। হৃষ্ট-পুষ্ট, প্রায় সাড়ে পাচ ফিট লম্বা এই মানুষটি পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা কালো পাঞ্জাবি পরতো। চোখে কালো চশমা এবং মুখ ভর্তি কালো চাপ দাড়ি। ট্রেনের বগিতে উঠে নিজের জায়গা করে নিয়ে শুরু করতো, ভাইসব, লেকচার-বক্তৃতা হয়তো অনেক শুনেছেন, তবে এবার শোনেন একটা গজল। বাম হাত কানে দিয়ে ডান হাত মুখের কাছে নিয়ে গজল শুরু করতো।

গজল শেষে চোখের কালো চশমা খুলে বলতো, আমি আগে চোখে দেখতে পারতাম না। কয়েক পারা কোরআন শরীফ মুখস্থ করার পর চোখে দেখতে পাই। চোখের খুব কাছে হাত নিয়ে দেখাতো। আমি এতো কাছ থেকে চোখে দেখতে পাই যা দিয়ে অন্য কোনো কাজ করতে পারি না। ভাইসব, আপনারা যে যা পারেন আমাকে সাহায্য করেন।

লোকটির গোছালো বক্তব্য শুনে প্রায় সবাই তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতো। নিঃসন্দেহে এই ভিক্ষুকটির আয় অন্য যে কোনো ফেরিওয়ালা, ক্যানভাসার, ভিক্ষুকের চেয়ে বেশি ছিল।

কয়েক বছর হলো বাগেরহাট-রূপসা রেল চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো এসব ফেরিওয়ালা ক্যানভাসার, ভিক্ষুক কেউ বেচে আছে, কেউ মরে গেছে, কেউ পেশা বদল করেছে, কেউ লাইন বদল করেছে।

ছোটবেলায় ট্রেনে দেখা ওই ভিক্ষুকটি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আমার মনে জমে আছে তখন থেকেই। ভিক্ষুকটি গজল গাওয়া শেষ হলে বলতো, আমি চোখে দেখতে পারতাম না অর্থাৎ অন্ধ ছিল। কয়েক পারা কোরআন শরীফ

মুখস্থ করার পর সে চোখে দেখতে পায়। আমার মনে জিজ্ঞাসা হতো, আদৌ কি ভিক্ষুকটি অন্ধ ছিল বা চোখে দেখতে পেতো না? সত্যি কি কয়েক পারা কোরআন শরীফ মুখস্থ করার পর সে চোখে দেখতে পারতো? ট্রেনের শ শ যাত্রীদের মধ্যে কাউকে দেখিনি ওসব প্রশ্ন করতে। তবে কি কারো মনে এসব প্রশ্ন উদয় হয়নি অথবা অজানা কোনো ভয়ে আসল ঘটনাটি জানা হয়নি।

এখন অনেক কিছু দেখি এবং বুঝি, কতো মানুষ ধর্মকে পুজি করে ব্যবসা করছে। তবে কি ওই ভিক্ষুকটিও ছিল তাদের দলে?

খুলনা থেকে

অপু

- শরীফ আহমেদ

এক.

আমাদের বাসার পেছনেই কিশোরগঞ্জ টু ময়মনসিংহ রেললাইন, ঠিক পেছনে না হলেও প্রায় আধা কিলোমিটারের ভেতরেই। সেই আধা কিলোমিটার ছিল শুধু সবুজ ঢেউ খেলানো ধান ক্ষেত আর ছোট্ট একটি বিল। তাতে অসংখ্যা শাদা বক।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নাক ডেকে ঘণ্টা দুই ঘুমানো ছিল আমাদের বাসার রেওয়াজ। সবাই প্রতিযোগিতা করে ঘুমাতো। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তেমন নিদ্রা বিলাসী ছিলাম না। সব সময় ছটফট করতাম কোনো একটা অঘটন ঘটানোর। সে কারণে মাঝে মঝ্যে প্রচণ্ড ধোলাই খেতে হতো বাসায় এবং সেই মহান কাজটুকু সম্পাদক করতেন আমার বাবা, ওনার ধোলাইয়ের কোনো গ্রামার ছিল না। হাতের কাছে যা পেতেন তা দিয়েই বিসমিল্লাহ করতেন। যদিও বাবাকে আমার মতোই ভালোবাসি।

তাদের এই ঘুমানোর সুযোগ নিয়ে একদিন এক ভয়ংকর প্ল্যান করে ফেললাম আমি এবং পাশের বাসার সাকিব মিলে। চুপি চুপি ঘর ছাড়লাম। আমরা তখন খুব ছোট। সবুজ ধান ক্ষেতের আল ধরে হেটে যাচ্ছি আর হাফ প্যান্টকে বার বার টেনে টেনে ধরছি। কারণ নিচে নেমে যাওয়ায় হাটায় বেশ সমস্যা হচ্ছিল। আমার হাফ প্যান্ট টানা দেখে সাকিব বড়দের মতো হাসে।

ঘর পালিয়ে ভয় ভরা বুকে নিজের এতোদিনের লালিত ইচ্ছাটা পূরণ করতে সবুজের বুক চিরে ভেসে ওঠা আল দিয়ে হেটে যাচ্ছি।

ভয় আর উত্তেজনায় সারা শরীর কাপছে দুজনেরই, কেউ কোনো কথা বলছি না। রেললাইনে পৌছে পাশেই কলা গাছের ঝোপের ভেতর অপেক্ষা করছি। কারণ রেললাইনের ওপাশেই সোহরাব স্যারের বাড়ি। দেখতে পারলে ডাবল ধোলাই। একবার বাবাকে নালিশের মাধ্যমে খাওয়াবেন, আরেকবার তিনিই ক্লাস-রুমে কিংবা ভর দুপুরের রোদে স্কুল মাঠে দাড় করিয়ে ভিটামিন ডি খাওয়াবেন। কাজেই সাবধান!

সে সময় মনে যে কি রকম শিহরণ কাজ করছিল তা বলে বোঝাতে পেরেছেন কেবল সত্যজিৎ রায় তার *পথের পাঁচালী*-তে।

অপু, দুর্গার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে সম্ভবত ১৯৮৯ থেকে ১৯৯০ সালের দিকে বই পড়ার মাধ্যমে। তখন আমি ক্লাস এইটের ছাত্র। পথের পাঁচালী নিয়ে অনেকেই অনেক প্যাচাল করেছেন স্বাধীনভাবে। এখানে শব্দ ধরাবাধা কাজেই ফিরে যাচ্ছি নিজের প্যাচালীতে। বুক ভরা ভয় আর রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষার মুহূর্ত শেষ হলো যখন ট্রেনের হুইসল শুনতে পেলাম। নীলগঞ্জের পরে বাক পেরিয়ে ট্রেনের প্রকাণ্ড ইঞ্জিনটা এদিকেই আসছে। কতো বড় রে বাবা!

এটা গুডস ট্রেন। গুডস ট্রেন ইংরেজিটা বাবা শিখিয়েছিলেন। এসব ট্রেনের অনেকগুলো বগি থাকে। সেদিন ট্রেনের এই বিশালত্বে বিমোহিত হয়েছিলাম। এমন সম্মোহিত হয়েছিলাম যে নড়াচড়ার কথা মনেই ছিল না অনেকক্ষণ।

সাকিব ডাকলো আমাকে দৌড়ের জন্য প্রস্তুত হতে।

ট্রেনের গতি কমে আসছিল তখন। কারণ মাইল দুয়েক পরেই স্টেশন। আর মাত্র পাচ ছয়টা বগি, তারপরই ইচ্ছা পূরণ, শেষ বগিটা ধরতে পারলেই ট্রেনে চড়া, কি মজা!

মাঠ গাড়ির শেষ ওয়াগনটা ধরতে পেরেছিলাম ঠিকই, তারপর ঝুলতে ঝুলতে স্টেশনে। এক অজানা অভিজ্ঞতায় শিহরিত হয়েছিলাম আমি আর সাকিব সেদিন। বাসায় ফিরে কিছু বলিনি কাউকে। কিন্তু সাকিবটা মারের ভয়ে গড় গড় করে সব বলে দিয়েছিল ওর মায়ের কাছে। তারপর ওর মায়ের কাছ থেকে আমার মা। অবশ্য আমার বাবা বাসায় ছিলেন না। তাই মা–ই সেদিন প্রক্সি দিয়েছিলেন বাবার হয়ে।

এরপরও বহুবার ট্রেনে চড়েছি, কলকাতা, দিল্লি, মালয়শিয়া, সিংগাপুর এবং সবশেষে মালয়শিয়ার আধুনিক ইন্টারসিটি LRT–তে যা ভূতল এবং ফ্লাইওভার দিয়ে সমানভাবে চলে। ওদের আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখে অবাক হয়েছি, বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য করুণাও হয়েছিল। কিন্তু শৈশবের সেই শিহরণ আর পাইনি যেটা ছিল আমার জীবনের প্রথম ঝুলতে ঝুলতে ট্রেন ভ্রমণ।

দুই.

বেশ কয়েক বছর আগের আরেকটা ঘটনা। সেদিন কমলাপুর রেলস্টেশনে *এগারসিন্দুর এক্সপ্রেস*–এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। যদিও ট্রেন দুই ঘণ্টা লেট। ওটা সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে চেড়ে যায় কিশোরগঞ্জ। একা দাড়িয়ে আছি। অধৈর্য হচ্ছি না। কারণ অনিয়মটাই এখন নিয়ম হয়ে গেছে আমাদের দেশে। ছয়টার গাড়ি অবশেষে আটটায় ছাড়লো যা রাত একটার দিকে গিয়ে পৌছাতে পারে আবার নাও পৌছাতে পারে, সবই উপরওয়ালার ইচ্ছা। আমরা এভাবেই সয়ে গেছি। যাই হোক, ট্রেন ছেড়েছে সেটাই আপাতত আশার কথা, পৌছানোটা বড় কথা নয়।

আমার সামনের দুটো সিট এখনো খালি, হয়তো এয়ারপোর্ট স্টেশন থেকে কেউ উঠবে। এদিকে কমলাপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌছাতেই মশার কামড়ে আমার ম্যালেরিয়া হওয়ার উপক্রম, আমি যদিও তথাকথিত ফার্স্ট ক্লাসে (শোভন)। সবে বুঝতে পারলাম কেন ওই ভদ্রলোক মশার কয়েল নিয়ে ট্রেনে উঠেছিলেন। আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম এয়ারপোর্ট স্টেশনে থামার সঙ্গে সঙ্গে কয়েল নিয়ে নেবো।

বহু বছর পর সেই সাকিবের সঙ্গে দেখা এই এয়ারপোর্ট স্টেশনে। সঙ্গে চারপাশ আলো করা মেয়েটাকে পরিচয় করিয়ে দিল ওর স্ত্রী বলে। আমি ভাবলাম ইয়ার্কি।

কিন্তু সাকিব সিরিয়াস। দোস্ত, আজই বিয়েটা সেরে ফেললাম, ওর ফ্যামিলির কেউ জানে না।

একটু কাছে এসে বললো, তুই যেমন লিলিআপাকে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করতে চাইতি ঠিক সেভাবে। যদিও এখন তিনি তিন বাচ্চার মা, তোর চেয়ে সামান্য ছোট একটা ছেলেও আছে শুনেছি।

হাসি আর অবাকও হই মনে মনে, এখনো ওর সব মনে আছে!

সবাই মিলে ট্রেনে উঠলাম। কাকতলীয়ভাবে আমার সামনের সিট দুটোই ওদের সিট। খুব বেশি অবাক হলাম না। তবে খুব ভালো লাগলো। অনেক দিন পর বাল্যবন্ধুর সঙ্গে অনেকক্ষণ থাকা যাবে।

সাকিব যাকে বিয়ে করেছে, মেয়েটির নাম বিলু। বাবা জাদরেল ম্যাজিস্ট্রেট। ওনার টাক্কু মাথায় রাজ্যের বুদ্ধি সবই... বিলুর চোখ রাঙানোকে উপক্ষো করে সাকিব বলে যাচ্ছিল।

অনেক দিন আগে সাকিব অবশ্য *হোটেল নিরব*–এ খেতে খেতে আমাকে বিলুর ছবি দেখিয়েছিল। তখন বিলু জাহাঙ্গীরনগরে পড়তো। তারপর ব্যস্ততায় আর খোজখবর তেমন নেয়া হয়নি। চার বছর একটানা প্রেমের পর আজ তার পূর্ণাঙ্গ রূপ নিল তাদের বিয়েতে।

ট্রেন চলতে চলতে অনেক কথা, অনেক স্মৃতি রোমন্থন আর ওদের সুখী চেহারা দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম বার বার।

সাকিবেরও কোনো বিকার নেই। এতো বড় একটা কাজ ঘটিয়ে দিব্যি হাসছে, গল্প করছে। অবশ্য এখন সাকিব মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত, মনে হয় একটু সিরিয়াস। কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তারপর কথা শেষ করে লাল হয়ে ওঠা নাক মুখ নিয়ে খুব চিন্তিতভাবে বসে রইলো।

বুঝলাম খুব সমস্যায় পড়েছে।

বিলু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে সাকিব?

বললাম, ভাব না দিয়ে চট করে বলে ফেল দেখি, সমাধান করা যায় কি না?

সাকিব মুখ ভার করে বললো, কিশোরগঞ্জ রেলস্টেশন পুলিশ ঘিরে রেখেছে এবং আমাদের অপেক্ষায় আছে, ধরতে পারলে সোজা বৃটিশ আমলের লাল দালানে। বাসা থেকেই ফোন এসেছিল।

বিলুর দিকে তাকালাম। মনে হয় এক্ষুণি কেদে ফেলবে।

সুন্দর অতীত আর সোনালি ভবিষ্যৎ ফেলে আমরা এখন কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি স্থির করে ফেললাম আর যাই হোক, কিশোরগঞ্জ যাওয়া যাবে না। কিন্তু যাবো কোথায়?

সাকিব তো বলেই ফেললো, দোস্ত, ভৈরব গিয়ে ট্রেন থেকে মেঘেনাতে ঝাপ দেবো, তবুও বিলুকে হারাতে পারবো না।

ওর কথা শুনে আমারো সেই মুহূর্তে খুব ইচ্ছা হচ্ছিল প্রেম করার, দুর্দান্ত সাহসী হওয়ার। ভালোবাসায় মানুষ পরিবর্তনশীল, ভালোবাসা মানুষকে দ্রুত সাহসী বানিয়ে দেয় আবার দুর্বলও করে দেয়।

অন্য কোনো অপশন না পেলে সাকিব যে ওই রাতে নদীতে ঝাপ দিতো সেটা নিশ্চিত ছিলাম সেদিন। সেদিনের ট্রেন ভ্রমণ সত্যিই খুব উপভোগ্য আর উত্তেজনায় পরিপূর্ণ ছিল প্রতিটা মুহূর্ত। ট্রেনের চেয়েও দ্রুত ঘুরপাক খাচ্ছিল আমার ভাবনা, কোথায় যাওয়া যায় ওদের নিয়ে?

ভৈরবে যশু খালার বাসায় যাওয়া যায়। কিন্তু ওনাকে আমার ভয় সেই ছেলেবেলা থেকে। বড্ড রাগী মহিলা। তবে একবার পটাতে পারলে তিনি যে নিজের ছয় তলা বাড়ি পর্যন্ত লিখে দিতে পারেন সেটা বুঝতে পেরেছি বড় হওয়ার পর। এবং ওখানেই রিকশাটা নেবো ভাবছি। শত হোক মায়ের বোন! সাকিব আর বিলুকে আশ্বস্ত করে খালাতো ভাই নাঈমকে ফোনে বললাম, যেন ভৈরব স্টেশনে থাকে, যা বলার দেখা হলে বলবো।

নাঈম বিশ্বাসই করছিলো না সে আমার সঙ্গে কথা বলছে।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পর আমরা যখন প্ল্যান নিয়ে খুব গভীরে তখনই সাগর কলার গন্ধ আর কুলিদের হাকাহাকিতে বাস্তবে ফিরলাম। ট্রেনের গতি কমছে, এক্ষুণি থাকবে। মানে ভৈরব এসে গেছি।

নেমে এলাম ট্রেন থেকে। নাঈম হাসতে হাসতে আমাদের সামনে এসে দাড়ালো। এই সেই নাঈম। এক সঙ্গে কতো মজার, কতো ভয়ংকর স্মৃতি।

নাঈম বাজিতপুর মেডিকেল থেকে এমবিবিএস শেষ করলো এ বছরই। বললাম, অর্ধযুগ পরও তুই আমাকে ঠিক চিনতে পারছি।

নাঈম বলে, কেন শিষ্যকে খাটো করো গুরু। তোমার মাথায় কয়টা চুল ছিল তাও বলতে পারতাম এক সময়।

হেসে জিজ্ঞাসা করি, খালাম্মার টাকা পয়সা এখন হিসাব মতো থাকে তো?

শুনে নাঈমও হেসে বলে, এখন তুমিও নেই, প্রজেক্টও নেই। তাই টাকারও দরকার নেই।

সাকিব ও তার স্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দিলাম নাঈমের সঙ্গে।

ঘাপলার কথা শুরু করতেই নাঈম বললো, বুঝে গেছি আর বলতে হবে না। ওরা আমাদের বাসায় থাকবে, মাকে সামলে নেবো। এবার চলো, প্রচুর কাজ আছে। শুধু বাসায় নিয়ে গেলেই তো আর হলো না! ফুল কিনতে হবে, বাসর ঘর সাজাতে হবে, তারপর ওদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার আছে।

সাকিব এতোক্ষণ সব শুনে কিছু বলতে যাচ্ছিল।

নাঈম তাকে থামিয়ে দিয়ে হাটতে লাগলো।

আমরা ওর পিছু নিলাম।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হতে পারতো যদি না বাস্তবতা রূপকথাকেও হার মানাতো।

আমরা স্টেশন থেকে বেরোনোর সময় পেছন থেকে কে যেন ডাকলো।

বিলু চমকে তাকালো লোকটির দিকে। তিনি হচ্ছেন বিলুর মামা।

বিলু সারাটা রাস্তা চুপচাপ ছিল, তেমন কথা বলেনি।

আমরা মূর্তির মতো দাড়িয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক নীরবতা ভেঙে বললেন, আপনারা সবাই স্টেশনমাস্টারের রুমে চলুন, ধোকা দেয়া কি এতো সহজ? বলেই বিলুর একটা হাত ধরে স্টেশনমাস্টারের রুমে ঢুকে গেলেন মামা।

সাকিবের হাত ধরে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম তারপর মামাকে অনুসরণ করলাম। আমাদের তখনো অনেক কিছু দেখার বাকি ছিল।

ভেতরে বিলুকে দেখলাম এক মহিলাকে জড়িয়ে ধরে কাদছে আর বলছে, আমার ভুল হয়ে গেছে আম্মু, অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে, আমাকে মাফ করে দাও।

নাঈম ফিশ ফিশ করে সাকিবকে বললো, ঘাবড়াবেন না, এ সময় মেয়েরা এমন কথাই বলেও যদি পারেন আপনিও ওনার পা চেপে ধরে হাউমাউ করে কেদে ফেলুন। ফল ভালোও হতে পারে।

সাকিব বের হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় বিলুর মা হুকুমের স্বরে বললেন, এই ছেলে, আর এক পা-ও নড়বে না, চুপচাপ দাড়িয়ে থাকো ওর বাবা এখানে না আসার আগ পর্যন্ত।

সেরেছে। বিলুর বাবাও নাকি আসবেন!

সাকিব এবার সত্যি পাথর হয়ে গেল কথাটা শুনে। ওর চোখ কেমন যেন বড় বড় হয়ে গেল।

ভেবেছো কি তোমরা? যা ইচ্ছা তা-ই করবে? এই কাণ্ডটা করার আগে একটিবারও তোমরা কেউ তোমাদের বাবা মায়ের কথা ভাবলে না, ওদের মানসম্মানের কথা ভাবলে না।

ভদ্রমহিলার প্রতি আমার কেমন যেন মায়া হলো। নাঈমকে ইশারা করলাম।

নাঈম এবার একনিষ্ঠ শিষ্যের মতো কথার ম্যাজিক দেখাবে অনেক দিন পর।

বিলুর মায়ের দিকে তাকিয়ে আছি আর দেখছি নাঈমের কথা শুনে ওনার চেহারা দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। শেষে সবাই মিলে রওনা দিলাম নাঈমের বাসায়।

নাঈম যতোই বলুক, ভয়ে ভয়েই আছি আর প্রার্থনা করছি, খালাম্মা যেন না ভাবেন আমি আবার নাঈমের মাথা খেতে এসেছি।

যশু খালা কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।

কিন্তু আমি অবাক ওনার এতো পরিবর্তন দেখে। আগের চেহারার সঙ্গে কোনো মিল নেই এখন। অবশ্য মানুষ বেচে থাকলে তার অনেক পরিবর্তন হয়। যশু খালা সেই ধারায়ই রয়েছেন।

বিলুর মা এখন খালার সঙ্গে বকবক করছেন আর প্রতিটা কথায়ই তিনি *আজকালকের ছেলেমেয়েরা* শব্দগুলো জুড়ে দিচ্ছেন।

বুঝলাম ক্ষোভ ঝাড়ছেন।

বিলু কি যেন ভাবছে ওর মায়ের পেছনে বসে।

আমি আর নাঈম ছাদে গেলাম সাকিব।

ছাদেরই এক কোণে বসে সিগারেট ফুকছে।

কাল আমরা সবাই যার যার মতো ফিরতি ট্রেনে ধরবো। নাঈমকে আমার সঙ্গে যাবার জন্য খালাকে কৌশলে টোপও দিয়ে রেখেছি। আমরা ফিরে যাবো কাল।

তাই বলে সাকিব-বিলুদের কাহিনী অসমাপ্ত থাকেনি।

এরও প্রায় মাস তিনেক পর ধুমধামের সঙ্গে ওদের বিয়ে হয়েছিল সেনাকুঞ্জে।

এখনো মাঝে মধ্যে ওরা যখন ট্রেনে করে কিশোরগঞ্জ আসে, ট্রেন থেকেই আমাদের ফোন করে, দোস্ত, আমরা এবার ভৈরব পেরোচ্ছি, সঙ্গে কে জানিস?

হাসি আর মনে মনে বলি, পাগল।

কিন্তু শেষবার, তাও বছর দেড়েক আগে একদিন ফোন পেলাম। এবারও বরাবরের মতোই সাকিব এবং বরাবরের মতোই প্রশ্ন ও আমার হেসে ওঠা। সাকিব বলে, আর হাসিস না, এবার আমার সঙ্গে কে বলতো?

বললাম, পারছি না।

সাকিব হেসে বলে, এবার আমরা আর দুজন নই, এবার আমরা আড়াইজন।

কথা বলার ঢঙ দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, অপু, না দুর্গা?

ও বললো, অপু। দোয়া করিস যেন তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। ওকে তোর বাদরামির ইতিহাস বলতেই হবে। তারপর হাসতে হাসতে লাইন কেটে দিল।

সউদি আরব থেকে
sharifwpi@yahoo.com

সিদ্ধান্ত

- আলতাফ হোসেন লাভ্লু

অনেক বছর আগের কথা। তখন আমি সদ্য তরুণ। রেলগাড়ি ছিল আমার প্রায় প্রতিদিনের যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম।

মফস্বলে আমাদের মতো তরুণদের বিনোদনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঐতিহাসিক যাত্রাশিল্প। শাহজাদপুরের অমলেন্দু বিশ্বাসের (নায়িকা অরুণা বিশ্বাসের বাবা) ছিল ঐতিহ্যবাহী অপেরা *চারুনিকা*। স্বনামধন্য একটি যাত্রা দল। দক্ষ শিল্পীদের সমন্বয়ে গঠিত দলটিতে এক ঝাক ডানাকাটা পরীর অপূর্ব নাচ, আকর্ষণীয় উপস্থাপনা আর মনকাড়া অভিনয় দেখার সাধ তখন আমার মতো রক্ষণশীল পরিবারের অনেক তরুণের মনে।

আমার ছিল *হিটলার* যাত্রাপালা দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছা। আজ শেষ রজনীতে প্রদর্শিত হবে *হিটলার*। জানতে পেরে মন ছটফট করছে। দলটি লাহিড়ী মোহনপুরে এক সপ্তাহ পরিবেশনা শেষে আগামীকাল চলে যাবে কলকাতা। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিলাম। রাত তখন পৌনে নয়টা। আর পনেরো মিনিট পরে শেষ ট্রেন।

সলপ স্টেশন থেকে যেতে হবে লাহিড়ী মোহনপুর, মাঝে উল্লাপাড়া স্টেশন। বাড়ি (রায়দৌলতপুর) থেকে সলপ স্টেশনের দূরত্ব দেড় কিলোমিটার হাটাপথ।

মোস্তফাকে সঙ্গী করে দৌড় শুরু করলাম। পূর্ববর্তী জামতৈল স্টেশন থেকে গাড়ির হুইসলের ক্ষীণ আওয়াজ পেলাম। ছুটি তো ছুটি। স্টেশনে পৌছার আগেই আমাদের পেছনে ফেলে রেলগাড়ি পৌছে গেছে স্টেশনে। হাপাতে হাপাতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছি।

পাচ হাত দূরে থাকা অবস্থায় রেলগাড়ি ছেড়ে দিল। শেষের বগিটি ছিল মালগাড়ি। উঠতে হলে আরো একটা বগি অতিক্রম করে উঠতে হবে। এদিকে আমাদের শক্তি কমতে থাকে আর রেলগাড়ির গতি বাড়তে থাকে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফেইলিওর হবো? না! কিছুতেই নয়।

হাপাতে হাপাতে মোস্তফা কোনো মতে উঠে পড়ে। আমি এক হাতে দরজার হ্যান্ডল ধরে রেলগাড়ির সঙ্গে দৌড়াচ্ছি। ওঠার মতো শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি। কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। উঠলেও বিপদ, ছাড়লেও বিপদ। এমন সময় দরজায় দাড়িয়ে থাকা এক আনসার আমার হাত ধরে টান দেন। মেঝেতে গিয়ে বসে পড়ি।

পরশুদিন যে এক জোড়া নতুন চামড়ার জুতা কিনেছিলাম উঠতে গিয়ে তার একটি পড়ে যায়। মুহূর্তে আরেক পায়েরটিও ফেলে দিই। এরপর পাচ মিনিট নীরবে মেঝেতে বসে বাতাস নিই। একটু সুস্থ হলে যাত্রীদের প্রশ্নের এক এক করে জবাব দিই। সবাই নিষেধ করেছিল ঝুকি নিয়ে উঠতে।

অধিকাংশ যাত্রীর প্রশ্ন ছিল দুইটি। *এক.* কেন আপনি জীবনের এই ঝুকি নিলেন? *দুই.* কেন আপনি এভাবে পায়ের জুতাটি ফেলে দিলেন?

উত্তরে বলেছিলাম, *প্রথমত.* আমি তারুণ্যের আবেগে একটি শখ মেটানোর মোহে রেলগাড়িতে চড়ার এই ঝুকিপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিয়েছি। এ মুহূর্তে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছি, এই সিদ্ধান্তটি ছিল ভুল। *দ্বিতীয়ত.* রেলগাড়িতে চড়তে গিয়ে এক পায়ের জুতা পড়ে যাওয়ায় আরেক পায়ের জুতা ছিল আমার কাছে অর্থহীন। ফলে তাৎক্ষণিক জুতাটি ফেলে দিই। কারণ এক জোড়া জুতা এক সঙ্গে যেই পাবে, অন্তত তার কাজে আসবে। যদিও আমার টাকার সঙ্গে জুতার মমতাও জড়িয়ে ছিল। কিন্তু দ্রুত সিদ্ধান্তটি ছিল সঠিক।

রেলগাড়ি ছুটে চলে। বাতাস এসে শরীরে দোল খাচ্ছে। চারদিকে আলো-আধারির অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। রেলগাড়ির সঙ্গে ছুটছে জোনাকি পোকার মিটি মিটি আলো। মনের মাঝে দোল খাচ্ছিল যাত্রার ডানাকাটা পরীর নাচ।

স্বল্প সময়ে লাহিড়ী মোহনপুর স্টেশনে এসে পৌছি। একটু দূরে খোলা মাঠে যাত্রার প্যান্ডল। *হই চই কাণ্ড, রই রই ব্যাপার*। প্রচণ্ড ভিড়।

পরিচিত সার্কলের সহযোগে এক প্রকার যুদ্ধ করে টিকেট কাটা হলো। কিছু সময় পর যাত্রার সেই পরিচিত সুর বাজিয়ে শুরু হলো নাচ। পালাক্রমে ডানাকাটা পরীর অসাধারণ নাচ। এরপর শুরু হয় হিটলার যাত্রাপালার প্রথম ডায়ালগ। চারদিকে পিনপতন নিস্তব্ধতা। কিছু সময় পর মন মাতানো নাচ আর অসাধারণ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয় হিটলার যাত্রাপালা। মুগ্ধ হয়ে ভাবি, না দেখলে মিস করতাম।

আবার চলে আসি মোহনপুর স্টেশনে। সিগনাল পড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সিরাজগঞ্জগামী ভোরের রেলগাড়ি চলে আসবে। ফিরবো পড়ালেখার গন্তব্য স্থলে।

পরিচিতদের নিয়ে হই-হুল্লা করে উঠে পড়ি। মজা করতে করতে বাড়ি ফিরি। সলপ স্টেশনে নেমে হাটতে হাটতে ভাবি, একটি রাত স্বপ্নের মতো কেটে গেল!

চিনাধুকুড়িয়া, সিরাজগঞ্জ থেকে

অপেক্ষা

- সোনা বৌ

ঢাকায় তখন আমি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। কিন্তু বাবার পেনশনের কারণে কিশোরগঞ্জ আসতে হবে এবং প্রথম দিনই বুঝলাম ঢাকা-কিশোরগঞ্জ আসা-যাওয়ার রেলওয়ে যোগাযোগের একমাত্র আন্তঃনগর ট্রেন *এগারসিন্ধুর*।

প্রথম দিনই ট্রেনটিকে আপন মনে হলো। ক্লাস করতাম ঢাকায় চাচার বাসাতে থেকে। ক্লাস ছুটি হলে বাবা নিয়ে আসতেন এই ট্রেনে করে। ও আমাকে প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে দূর হতে বিদায় জানাতো। যখন ট্রেনটি সংকেত দিয়ে ছাড়তো তখন মনে হতো পেছনে ফেলে এসেছি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এতো কষ্ট হতো বাসায় এতো আপনজনের মাঝে থেকেও।

তারপর ক্লাস শুরু হলে ঢাকায় এলে দেখা হতো ছুটির দিনে অথবা লাঞ্চব্রেকে ধানমন্ডি লেকে। আমার হাত দুটো আলতো করে ধরে বলতো, জানো, আমি শুধু ভাবি কবে এই ট্রেনটিকে করে যাবো আর যখন পৌছাবো তখন দেখবো তুমি খুব সুন্দর করে সেজে আমার জন্য দরজায় অপেক্ষা করছো। দেখো, একদিন আমার এই স্বপ্ন পূরণ হবে।

ওর এই স্বপ্ন আমিও প্রতি রাতে দেখতাম। এবং মনে মনে প্রার্থনা করতাম কবে আমাদের বিয়ে হবে। আমাকে অবাক করে দিয়ে সৃষ্টিকর্তা আমার এই প্রার্থনা কবুল করে দিল। অনার্স ফাইনালের পর আমাদের বিয়ে হলো।

কি যে ভালো লাগা আর আনন্দ দিল এই দিনটি! সবচেয়ে ভালো লেগেছিল, সে যখন আমাকে পাওয়াটা তার জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা বলে জানালো।

আল্লাহকে অনেক থ্যাংকস দিলাম এতো সুন্দর কথা শোনানোর জন্য।

অপেক্ষা করার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল।

অনেক রাতে *এগারসিন্ধুর* ট্রেন পৌছালে প্ল্যাটফর্মে বাসা থেকে হুইসল শুনতে পাই। দরজায় অপেক্ষায় থাকি। ওর আসার শব্দ পাই।

আমার কাছে এসে আলতো করে গালে হাত দেয়। চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। আমার চুড়ি, কানের দুল সব কিছুতেই। কি যে ভালো লাগে সেই অনুভূতি!

সোনা বৌ অপেক্ষা করছিলে আমার জন্য?

আমি নীরব থাকি।

পরিচিত ওকে এতো অপরিচিত লাগে!

আমাকে *লক্ষ্মী সোনা বৌ* বলে আলতো করে বুকে জড়িয়ে ধরে।

পার্থিব জগতের কোনো সুখের সঙ্গে এর তুলনা খুজে পাই না। কি যে অপার্থিব সুখে আর ভালোবাসায় আমাকে ভাসিয়ে সে নিয়ে যায় অন্য জগতে! তখন তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ শতগুণে বেড়ে যায়। ভাবি এতো চমৎকার স্বামী আমার ভাগ্যে আর ধন্যবাদ দেই সৃষ্টিকর্তাকে।

এখনো ট্রেনের হুইসল কানে আসে। কিন্তু এখন অবস্থাটা বদলে গেছে। আমি ট্রেনের অপেক্ষায় থাকি না। অপেক্ষায় থাকি কোনো এক এয়ারলাইন্সের জন্য।

কবে, কবে ও দেশে ফিরবে?

কিশোরগঞ্জ থেকে

অসহায় প্রতিবাদী

- আনোয়ার এ. করিম

১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে বাবার সঙ্গে *সমতা এক্সপ্রেস* ট্রেনে চড়ে গ্রামের বাড়ি ফেনী যাচ্ছিলাম। আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। তেজগাও রেলস্টেশন থেকে গাড়িতে উঠে যাত্রা শুরু করলাম। টংগি পার হয়ে এলে দেখলাম বাবা এক যাত্রীর সঙ্গে তর্কাতর্কি করছেন। সেই যাত্রী একটি টিনের পাত্রে পেট্রল নিয়ে যাচ্ছেন।

বাবা সে যাত্রীকে বোঝাতে চাচ্ছেন, রেলওয়ের আইনে যাত্রীবাহী বগিতে যে কোনো ধরনের জ্বালানি পদার্থ বহন করা নিষেধ।

অনেক যাত্রীই ধূমপান করছেন, যদি আগুন লেগে যায় এই ভয়ে বাবা ও আমি ভীত। এক সময় ট্রেন নরসিংদী এসে থামলো। বাবা নেমে রেলওয়ে পুলিশ ডেকে এনে পেট্রল বহনকারী যাত্রীকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলেন।

নির্ভয়ে চলতে থাকলাম। ট্রেন ভৈরব এসে থামলো। একি, সেই যাত্রী! জানালা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে বাবাকে বিশ্রী ভাষায় গালমন্দ করছেন, বাবা তখন অসহায়ের মতো বলছিলেন, এই এলাকা আপনার আপনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। কিন্তু আমি তো অন্যায় করিনি। চলন্ত ট্রেনে আগুন লাগলে আপনি, আমি সকলে অগ্নিদগ্ধ হতাম। এবং আমিও একজন সরকারি কর্মকর্তা, আমারও দায়িত্ব আছে জানমাল রক্ষা করার।

উল্লেখ্য যে, আমার বাবা ভূমি মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা ছিলেন।

ট্রেন ছেড়ে দিল। দূর থেকে দেখা গেল, লোকটি হাত নেড়ে তার ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। আর আমরা হাপ ছেড়ে বাচলাম।

ফার্মগেট, ঢাকা থেকে

কৌশল

- নাজমুন নাহার মুক্তা

এক্সকিউজ মি। কাইন্ডলি উঠুন, এটা আমার সিট।

গল্পের বই থেকে চোখ না তুলেই তিনি বললেন, সরি।

কেন?

কারণ এটা আমার সিট।

দেখুন, আপনি ভুল করছেন। আমার টিকেটে এই সিট নাম্বারের কথাই লেখা আছে। সুতরাং টিকেট দেখে আপনার শিওর হওয়া উচিত।

বইটা বন্ধ করে আমার চোখে চোখ রেখে তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, শিওর হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার মেমরি কখনোই আমার সঙ্গে বিট্রে করে না। বলেই আবার বইয়ের পৃষ্ঠায় ডুবে গেলেন।

মেজাজটাই খিচড়ে গেল। ইচ্ছা করছিল একটানে বইটা কেড়ে নিয়ে ট্রেনের জানালা দিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলি।

আজ আমরা সপরিবারে কক্সবাজার যাচ্ছি। তবে সমুদ্র দর্শন করতে নয়, আগামীকাল পূর্ণিমা। বিচে বসে পূর্ণিমা রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করার উদ্দেশ্যে কক্সবাজার যাত্রা।

না। সে এখনো গল্পের বইয়ে ডুবে আছে। আমার পক্ষে আর ধৈর্য ধরা সম্ভব না। রূঢ় ভাবে বলি, অভদ্রতারও একটা সীমা থাকে। আপনার তাও নেই।

এতে কাজ হলো। টিকেট বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, দেখুন, ভালো করে দেখুন, আমি অন্য কারো সিটে বসেছি কি না?

ওহ মাই গড!

দুজনের সিট নাম্বার এক হলো কি করে? এখন কি হবে?

একটা উপায় আছে। আগে বলুন, আপনি কবে টিকেট কেটেছেন?

কেন?

যে আগে টিকেট কেটেছে সেই পাবে এই সিট। আমি গত পরশু টিকেট নিয়েছি। আপনি?

গতকাল।

তাহলে তো হয়েই গেল। প্রবলেম সলভড।

মানে?

মানে, আমি যেখানে বসেছি সেখানে বসেই বাকি পথটুকু যাবো।

তারপর এমনভাবে হাসলেন যেন বিশ্ব জয় করে ফেলেছেন।

মুহূর্তেই আমার মাথার মধ্যে জেদ চেপে বসলো। মনে মনে ঠিক করলাম, এখানেই বসবো, যেভাবেই হোক না কেন।

আমাদের চেচামেচিতে ততোক্ষণে টিটি এসেছেন। ভালো করে দেখে বললেন, সরি, ভুল করে দুজনকে এই সিট দেয়া হয়েছে। কিন্তু পাশেরটা কাউকে দেয়া হয়নি। নিজেদের মধ্যে ঠিক করেন কে কোনটাতে বসবেন।

এবার খুব বিনয়ের সঙ্গে বলি, আসুন টস করি। দুইটা কাগজে দুজনের নামের প্রথম অক্ষর লিখবো। আপনি একটা কাগজ ওঠাবেন। যার নামের প্রথম অক্ষর উঠবে সে জানালার পাশে বসবে। ওকে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, ওকে, আমি রাজি।
আপনার নামটা বলুন, লিখতে হবে তো।
সৌমিক।
মনে মনে বলি নামটা তো সুন্দর। ব্যবহার কেন এতো...।
যাই হোক। টসে আমার নাম ওঠে। সুতরাং পূর্বশর্ত অনুযায়ী জানালার পাশের সিটটি আমার হলো।
পরে অবশ্য ভাবী আমার পাশে বসেছিলেন। আর সৌমিকের সিট হয় ভাইয়ার পাশে।
চট্টগ্রামে নেমে সৌমিককে বলি, যুদ্ধে জিততে হলে কৌশলী হতে হয়, জানেন তো?
জানি।
বিশ্বাস করেন?
অবশ্যই।
তাহলে বলি, দুটো কাগজেই আমার নামের প্রথম অক্ষর লেখা ছিল!
সৌমিক আমার দিকে গোল গোল চোখে তাকিয়ে থাকলো।
হাসতে হাসতে বললাম, আমেরিকা আবিষ্কারের পর কলাম্বাস কতোটুকু খুশি হয়েছিলেন জানি না। তবে আমি তারচেয়েও বেশি খুশি। বলেই বিজয়ী বীর সৈনিকের মতো সামনের দিকে হাটতে থাকি।

মিরপুর, ঢাকা থেকে
najmun@mail.com

জাপানে

- মোসাররাত হোসেন

জাপান রেলওয়ে অর্থাৎ JR। অতুলনীয় তার ব্যবস্থাপনা। আমি ২০০৪-এ জাপান এসেছি। কানসাই এয়ারপোর্ট, ওসাকা থেকে ট্রেনে করে খানাযাওয়া (Kanazawa)-তে এসেছি।
এখানে ট্রেন ভ্রমণ খুবই আরামদায়ক। মোটেই ক্লান্তি লাগে না। গরমে এসি এবং শীতে হিটার চলে।
আমরা ট্রেনে ওঠার আগেই ট্রেন পরিষ্কার করা হলো। পরিষ্কার করার সময় সিটগুলো অটোমেটিক ঘুরে পরিষ্কার হচ্ছিল।
এখানে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী ট্রেন চলে। কিছুক্ষণ পর পর ট্রেন আছে। বিভিন্ন ধরনের ট্রেন সার্ভিস যেমন : *র‍্যাপিড এক্সপ্রেস, লুপ লাইন* (Loop line) ট্রেন, লোকাল ট্রেন এবং বুলেট ট্রেন *শিনকানসেন* (Shinkanshen) আছে। ট্রেনের ভেতরে জাপানিজ ও ওয়েস্টার্ন দুই ধরনের টয়লেট আছে। ট্রেন ক্রু খাবার এবং পানীয় ট্রলিতে নিয়ে বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টে যায়। যার যা প্রয়োজন, নিঃশব্দে কিনে খায়। ট্রেনে কোনো হকার নেই। এখানে স্মোকিং ও ননস্মোকিং রিজার্ভড ও ননরিজার্ভড দুই ধরনের কম্পার্টমেন্ট আছে। ননরিজার্ভড ট্রেনে টিকেটের দাম তুলনামূলক কম।
আমি, আমার স্বামী ডা. আযম ও মেয়ে আনিকা বেড়ানোর উদ্দেশ্যে ওসাকাতে ইউনিভার্সাল স্টুডিওস জাপানে বেড়াতে গেলাম। এখানে আছে হলিউড মুভি থিম পার্ক। আমরা খানাযাওয়া থেকে *র‍্যাপিড এক্সপ্রেস*-এ ওসাকা গেলাম। ওখানে স্টেশন লকারে আমাদের লাগেজ রেখে ইউনিভার্সাল স্টুডিওর স্পেশাল ট্রেনে উঠলাম।
এই ট্রেনটির পুরো জায়গায় এনিমেশন ছবির বিভিন্ন চরিত্রের ছবি আকা ছিল। খুবই কালারফুল, রঙ রঙে ট্রেনটি আমাদের ইউনিভার্সাল সিটিতে নামিয়ে দিল। স্টেশন থেকে বেরুতেই চোখে পড়লো অসংখ্য রেস্টুরেন্ট ও গিফট শপ।

টিকেট কেটে মূল স্টুডিওতে ঢুকলাম। ভেতরে ঢুকে মুগ্ধ হলাম। মনে হচ্ছিল আমেরিকায় চলে এসেছি। আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের আদলে গড়ে উঠেছে এই সিটির বিভিন্ন স্টট। এমনকি বিখ্যাত সব শপ ও রেস্টুরেন্টগুলো একইভাবে রাখা হয়েছে।

এতে রয়েছে বিভিন্ন আকর্ষণ যেমন Shrek's 4-D, Spiderman, Snoopy's Sound Stage Adventure, Jurassic Park, E.T.। এছাড়া লাইভ পারফরম্যান্স রক অ্যান্ড রোল শো। হলিউড হাই টোনস, গোল্ডেন ওলডিজ ইত্যাদি। তাছাড়া বিভিন্ন কাফে, ডাইনিং ও সুভেনির শপ তো রয়েছেই।

নব্বই মিনিট লাইনে অপেক্ষা করে Shrek's 4-D মুভিজ উপভোগ করলাম।

আনিকা ছোট। বয়স বিশ মাস বলে এই শোতে এলাউড না বলে প্রথমে আযম ও পরবর্তী শোতে আমি পালা করে গেলাম। প্রায় প্রতিটি এট্রাকশনে দীর্ঘ সময় ওয়েটিং থাকায় আমরা সিটি ওয়ার্কিং বেছে নিলাম।

আনিকা-কে স্ট্রলারে বসিয়ে আমরা বিভিন্ন স্টট শো উপভোগ করলাম।

এরপর রাতে ওসাকা স্টেশনে এসে লকার থেকে আমাদের লাগেজ নিলাম। রাতের খাবার কিনে নিয়ে খানাযাওয়ায় ফেরার জন্য *র‍্যাপিড এক্সপ্রেস থান্ডারবার্ডস* (Thunderbirds)-এ উঠে বসলাম।

খানাযাওয়া, জাপান থেকে
mosharrat69@yahoo.com

অবাধ্য দুটি চোখ

- সুজন

২৫ পৌষ। তারিখ অনুযায়ী শীতের তীব্রতা সঙ্গত। এসেছি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষা শেষ। এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। আমাদের বাড়ি যাওয়ার একটাই ট্রেন, *মধুমতি এক্সপ্রেস*। ছাড়ে সকাল ছয়টায়।

শীতের মধ্যে অনেক কষ্ট করে ভোরে স্টেশনে গেলাম এবং টিকেট নিলাম। ট্রেনে উঠে আমার আসনে বসলাম। আমার আশপাশে এক বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই বড় একা লাগছিল।

অবশ্য আমার পেছনে আরো চারজন পরীক্ষার্থী ছিল। ওদের তিনজন ছাত্রী এবং একজন ছাত্র। কথাবার্তায় বুঝলাম বাড়ি আমাদের থানায়। ওরা খুব মজা করছিল, গল্প করে। আমারো যোগ দিতে ইচ্ছ করছিল। তারপরও কাছে যেতে পারলাম না। কারণ ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে আমি সচেতন সেই ছোট থেকে।

গাড়ি ছেড়েছে অনেক আগে। ইতিমধ্যে পৌষের ঘন কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের আলো আসছে। তারই কিছু অংশ আমার গায়ে লাগছে। বেশ আরাম পাচ্ছি।

আমার কয়েক গজ সামনে দেখলাম একজন পত্রিকা পড়ছে। ব্যাগ রেখে চলে গেলাম পত্রিকা পড়তে।

পত্রিকা পড়া শেষ করে দেখি গাড়ি ঈশ্বরদী ছেড়ে পদ্মার কাছে চলে এসেছে। জানালা দিয়ে মাথা বের করে দেখলাম সদ্য তৈরি লালন বৃজ। বেশ সুন্দর দেখায় দূর থেকে।

দেখা শেষ। আমার আসনে গেলাম। কিন্তু অবাক হলাম। আমার সিটে একটি মেয়ে বসা।

মেয়েটির মাথার ওপর থেকে ব্যাগ নামিয়ে গায়ের জ্যাকেট খুলে রাখলাম ব্যাগে।

ওই মেয়েটি বুঝলো সিটটি আমার।

এবার মেয়েটির পাশে বসলাম।

কিন্তু একটু পরে মোটা এক ভদ্রলোক এসে বললো, এই সিট আমার।

কি আর করা? উঠে দাড়ালাম।

ভদ্রলোকটি বললেন, তোমার সিট কোথায়?

বললাম।
তিনি আমাকে বললেন, আমার সামনেই বসো।
ট্রেনে যারা চড়েছেন তারা বুঝবেন যে, পাশাপাশি সমান্তরালে দুটি লম্বা বড় সিট থাকে, এতে বসতে হয় ছয়জনকে।
লোকটির কথা মতো বসাতে আমার আর ওই মেয়েটির অবস্থান হলো কোনাকুনিভাবে মুখোমুখি।
একটু পরে মেয়েটির বাবা ও ছোট ভাই এলো এবং আমার পাশে বসলো।
বুঝলাম ওরা ঈশ্বরদী থেকে উঠেছে।
মেয়েটির পোশাক ছিল কালো রঙের বোরখা। হাতে মোজা, পায়ে জুতা। শুধু তার চোখ দুটি খোলা ছিল।
ওর বাবার পরনে ছিল বড় পাঞ্জাবি। মুখে কাচা-পাকা বড় দাড়ি। মাথায় পাগড়ি এবং তিনি ছিলেন বড় দেহের অধিকারী।
ভাবছিলাম চারদিকে যখন নোংরা পোশাকের ছড়াছড়ি তখন এরা কতো সংযত হয়ে আছে!
অনেকক্ষণ কেটে গেল।
যেহেতু অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই খেয়াল করিনি। কিন্তু মনে হলো মেয়েটি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। হ্যা, সত্যিই তাই। তাও একদৃষ্টিতে। আমি তো অবাক! কিন্তু আমার একটু ভয় হচ্ছিল। কারণ ওর সামনে এবং আমার পাশেই বসা ওর বাবা। ওর বাবার দিকে চোখ রাখলাম। দেখি তিনি ঝিমুচ্ছেন।
ছোটবেলা থেকে এমন অবস্থায় কোনোদিন পড়তে হয়নি। এই প্রথম।
এতোক্ষণে গাড়ি পোড়াদহ স্টেশনে এসেছে। দাড়াবে বিশ পচিশ মিনিট। এই সুযোগে বাইরে হাটতে বেরুলাম। একা হাটছি প্ল্যাটফর্মে। গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ওই মেয়েটি জানালা দিয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।
তখন বুদ্ধি করে গাড়িতে ফিরে এলাম। সিটে গিয়ে দেখি ওর বাবা, ভাই এবং মোটা লোকটা হাটতে গেছে বাইরে। আমার সিটে বসলাম।
সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। আর তখনই পর পর দুবার সে চোখ মারলো।
আমার দেহে কম্পন মাত্রা রিকটার স্কেলে আট ছাড়িয়ে গেল। আমার শিরায় শিরায় যেন সুনামির মহা প্রলয়ংকরী ঢেউ বইতে থাকলো।
একটু পরে ওর বাবা, ভাই এবং মোটা লোকটা এসে বসল।
গাড়ি ছেড়েছে পনেরো মিনিট আগে। এই সময়ের মধ্যে আর মেয়েটার দিকে তাকাইনি। বলতে পারবো না কি জন্যে, হয়তো ভয় লেগেছিল।
কিছু পরে চেয়ে দেখি সে তখনো আমার দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু এবার বিষণ্নতার চোখ।
অন্য সবাই ঝিমুচ্ছেন। শুধু আমি আর ও সচেতন আছি।
মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হেসে দিলাম।
ব্যস। সে চোখ মারলো পর পর তিন চারবার।
ভালোই লাগছিল। সারা পথ ধরে তার চোখের ইঙ্গিতগুলো বেশ মজা লাগছিল।
সারা পথে ত্রিশ পয়ত্রিশবার সে চোখ মেরেছিল। আর আমি শুধু হেসেছিলাম।
এবার নামতে হবে। তাই ব্যাগটা কাছে আনলাম।
কিন্তু দেখি তার চোখ টলমল করছে।
গাড়ি থেমেছে। সুতরাং নামতে তো হবেই। শেষে সাহস করে একটু হাত নেড়ে নেমে পড়লাম।
পরে দেখি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে।

এবার আমি চোখ মারলাম।

ও যেন একটু হাসলো।

ট্রেন ছেড়ে দিল।

রিকশায় উঠলাম। ভাবলাম অবাধ্য চোখ দুটিকে ঢাকতে পারেনি তার ধর্মীয় অনুশাসন এবং তার বাবা।

পাংশা, রাজবাড়ী থেকে

আঙুল

- বিভা চৌধুরী

জীবনে একবার ইচ্ছা করেছি ট্রেনে ভ্রমণ করবো। আমার ফুপাজি দেওয়ানগঞ্জ সুগার মিলের ইঞ্জিনিয়ার চাকরি করেন। তাই আম্মার সঙ্গে বায়না ধরলাম ফুপুর বাসায় যাবো। তাহলে ট্রেনে যাওয়া হবে।

অবশেষে যেই ভাবা সেই কাজ। ইনটারমেডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষা দিয়ে রওনা দিলাম। বেশি দিন আগের কথা নয়। ১৯৮৫ সালের জুন মাস হবে সম্ভবত।

যাহোক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আমি। কারণ এই প্রথম ট্রেনে ওঠা। সত্যি কথা বলতে কি, এ বয়স পর্যন্ত এখনো ট্রেন দেখা হয়নি। অনেক কল্পনা, সাধ, আনন্দও বটে। এগুলো মনে মনে রপ্ত করছিলাম আর ভাবছিলাম এ যাওয়া যদি রোমান্টিক হতো!

ভ্রমণের সময়গুলো কারো জন্য স্মৃতি হয়ে থাকবে। পরে আবার কেউ ভুলেও যেতে পারে। আমি ভুলিনি। কারণ আমার সাধের পরিণাম যে কি হয়েছিল তার বিবরণ দিচ্ছি।

ট্রেন চলছে ঝুক্কুর ঝুক্কুর ছন্দ–পতনের শব্দের মতো মনে হচ্ছিল। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জানালায় হাত রেখে দেখলাম। জানালার পাল্লাটা উপরে ওঠানো ছিল। মনে হয় সিটকিনি দেয়া ছিল না। হঠাৎ আমার পাচটা আঙুলের শেষের দুই আঙুলের ওপর সা–আ–ট করে পড়লো। জানালার সাটারে মতো পাল্লাটা। অমনি চিৎকার করে উঠলাম উঃ! কি যন্ত্রণা।

তারপর আমার ফুপু কোনো রকমে ব্যান্ডেজ করে দিলেন।

তাতেও কি আর ব্যাথা কমে! প্রচণ্ড ব্যথা বেড়েই চললো।

ট্রেনে চেইন টানার ব্যাপারটি জানতাম না।

আপনি অনুমতি দিলে চেইন টেনে ট্রেন থামিয়ে দেবো। পাশের এক ভদ্রলোক বলছিলেন।

কারণ তাহলে নেমে কোনো সেবাসদন কিংবা হাসপাতাল থেকে ভালো করে ব্যান্ডেজ কিংবা ওষুধ দেয়া যাবে।

হ্যা, তাই হলো। অনুমতি দিলাম।

ট্রেন থেমেছে। কিন্তু হায় কপাল, আশপাশে কোনো হাসপাতাল কিংবা সদন, ক্লিনিক কিছুই ছিল না। অবশেষে ট্রেনে ওঠে এমনিভাবেই স্টেশনে পৌছায়।

এই ট্রেন ভ্রমণে আনন্দিত হয়েছি বটে, পাশাপাশি বিপর্যস্তও হয়ে গেলাম। সাধের শখ, ধুলায় মিশে গেল। জানি না কার অভিশাপে এমন হয়েছিল। আমার আঙুল দুটো বেশ ক্ষত হয়ে গেল।

ব্যক্তিগত জীবনে আমার কিছু সাধ যেমন হারিয়ে গেছে তেমনি ট্রেন ভ্রমণের ওই সাধও আমাকে বেশ কষ্ট দিয়েছে।

মোকামতলা, বগুড়া থেকে

পথভ্রমণ

- মোহাম্মদ শহীদুল কায়সার লিমন

এক.

তখন খুব ছোট। আমাদের বাড়ি থেকে এক দুই কিলোমিটার দূরে রেললাইন। কিন্তু তখনো রেলগাড়ি দেখতে যাওয়া হয়নি। শুধু শব্দ শুনি আর বড়দের কাছে রেলগাড়ি দেখানোর জন্য বায়না ধরি।

বড়দের কাছে আরো বিচিত্র সব রেলগাড়ির নাম শুনতাম এবং পুলকিত হতাম।

একদিন ছোট চাচার সঙ্গে গাড়ি দেখতে গেলাম। তখন দুপুরবেলা। বিশাল লম্বা ট্রেন। প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে দরজার কাছে অনেক লোকজন ঝুলে আছে। ট্রেন দেখছি আর উত্তেজনায় কাপছি। হঠাৎ ট্রেনের হুইসল বাজালো। আমি এতো শব্দে ভয় পেয়ে চিৎকার দিয়ে কেদে ফেললাম।

দুই.

একবার রিকশা থেকে নামতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেলাম। ফলে হাতে আঘাত পেলাম। ডান হাতের হাড় ভেঙে গেল। চিকিৎসা করতে হবে! গ্রামে তখন কবিরাজি চিকিৎসা বহুল প্রচলিত। আর দত্তের বাজারে (ময়মনসিংহ জেলার গফরগাও উপজেলায় অবস্থিত) মজিদের হাড় ভাঙা চিকিৎসা ও মজিদের পড়া তেল (মালিশ করার জন্য) তো বিখ্যাত! সে সময় মশাখালী গেলাম ট্রেনে চড়ে। আমার বাড়ির পার্শবর্তী সাতখামাইর স্টেশন থেকে মশাখালী স্টেশন। এটাই আমার জীবনের প্রথম ট্রেন ভ্রমণ।

তিন.

তখন ক্লাস টুতে পড়ি। ১৯৯০ সালের ঘটনা। আমাদের স্কুলের পাশেই রেললাইন। এখানে নদীর তীরে ছোট্ট একটি গ্রাম্য হাটও রয়েছে। জায়গাটির নাম গোলাঘাট। নদীর ওপর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। ঢাকা টু ময়মনসিংহ। এখানেই একদিন সন্ধ্যায় ঘটলো এক ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা। রেললাইন থেকে বেশ কয়েকটি বগি পড়ে গেল নদীতে। শুধু ইঞ্জিনটুকু রক্ষা পেয়েছিল। তৎক্ষণাৎ মারা গেল কয়েকজন। নিহতের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক আর আহত দুই শতাধিক।

তখন স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের সেন্সরশিপের কারণে পত্রিকায় খবর বের হলো ট্রেন দুর্ঘটনায় পাচজন নিহত আর আহত পচিশজন। রেডিও, টিভি দিল আরো বেঠিক খবর, তিনজন নিহত, পনেরোজন আহত।

সেদিন স্থানীয় লোকজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল দুর্ঘটনায় কবলিত লোকজনদের উদ্ধার কাজে। আমার ছোটচাচাও সেখানে ছিলেন। আহত লোকজন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কিন্তু প্রশাসনের সেদিকে নজর নেই। ইউএনও–র নেতত্বে মৃত লোকজনদের গাড়িতে করে উপজেলা সদরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই হলো অবস্থা। এসবই আমার বাবা, চাচা ও অন্য বড়দের কাছ থেকে শোনা। পরদিন সকালে আমরা ছোটরাও ট্রেন দেখতে যাই। কতোগুলো বগি নদীতে অর্ধনিমজ্জিত, কতোগুলো নদীর ওপরে। তখন ছিল শুকনো সময়। তাই নদীতে পানিও ছিল না বেশি।

চার.

তখন ক্লাস ফোরে পড়ি। বর্ষাকাল। আমাদের এলাকায় এক পাগল লোক ছিল। সব সময় বিড়বিড় করে কি যেন বলতো। পাগলটির নাম এখন মনে করতে পারছি না। একদিন সে গেল রেল লাইন পার হতে। এখানে উল্লেখ্য যে, গোলাঘাটে নদী পার হওয়ার জন্য আলাদা কোনো সেতু ছিল না। লোকজন রেললাইন দিয়েই নদীর অপর পাড়ে যেতো। অর্থাৎ রেললাইনটি সেতুর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতো। ওই পাগল যখন

রেললাইনের মাঝামাঝি তখন ট্রেন এসে গেল। কিন্তু পাগল কোনোদিকেই যাচ্ছে না। বাজারের লোকজন চেচামেচি করে পাগলকে দৌড়ে চলে আসার জন্য বলছে। অনেকে নদীতে লাফ দেয়ার জন্য বলছে।
কে শোনে কার কথা! ট্রেনের ধাক্কায় পাগলটি রেল সেতুর পিলারের ওপর পড়লো এবং শেষে নদীতে পড়ে গেল। পিলারে শরীরের মাংসসহ কতোটুকু হাড্ডি পড়ে আছে। আমরা স্কুল থেকে দল বেধে দেখতে গেলাম। তিন দিন পর নদীতে (ভাটি অঞ্চলে) লাশ ভেসে উঠলো।

পাচ.

পারভেজকাকা। আমরা সবাই কাকা বলে ডাকি। আমার বড় চাচা কাঠের ব্যবসা করতেন। গ্রাম অঞ্চলে কাঠ পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম গুরুর গাড়ি আর নদী পথে নৌকা। এমনি একদিন নৌকা করে কাঠ আনছেন। ইঞ্জিন চালিত ট্রলার। গোলাঘাট নামের জায়গায় এসে কাঠ ভর্তি ট্রলার থামালেন। কারণ তিনি দেখলেন নদীর কাদা পানিতে একজন লোক পড়ে আছে। চাচা কাছে এসে দেখলেন এখনো জীবিত। তিনি ট্রলারের চালকের সহযোগিতায় লোকটিকে ট্রলারে ওঠালেন। নদীর পানিতে কাদা ধুয়ে করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন।
লোকটি কোনো কথা বলছে না, দাড়াতে পারছে না। চিকিৎসার পর আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসলেন। এক সপ্তাহ পর সুস্থ হলেন। তখন জানা গেল তার কথা। নাম পারভেজ। বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর। ঢাকায় রাজউক-এ চাকরি করেন। ট্রেনে করে ঢাকা যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছয় হাজার টাকা ছিল। প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে ট্রেনের ছাদে উঠেছিলেন। সঙ্গের একজন লোক টাকা নিয়ে ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন নদীতে। এরপরের ঘটনা তো আগেই লিখলাম। সেই থেকে পারভেজ কাকা আমাদের বাড়িতে আত্মীয়ের মতো মাঝে মধ্যেই বেড়াতে আসেন।
আমার বুঝে আসে না, একজন মানুষ কি করে মাত্র ছয় হাজার টাকার জন্য একজন মানুষকে মেরে ফেলতে পারে! ধাক্কা দিয়ে ট্রেন থেকে ফেলে দেয়া তো মেরে ফেলারই নামান্তর। হয়তো পারভেজ কাকা ভাগ্যগুণে বেচে গেছেন।

বরনল, শ্রীপুর, গাজীপুর থেকে

নিষ্ঠুর সত্য

- জুই

বিয়ের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। বাবা-মা অনেক জোর করে বিয়ে দিয়েছে। এমনকি বিয়ে না করার জন্য আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম।
বিয়ের পর এক সময় নিজের অজান্তে স্বামীকে মেনে নিয়েছি।
বিয়ের পর পরই স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি ঢাকায় ট্রেনে করে। আমি খুব খুশি। কারণ আমি ঘুরতে খুব পছন্দ করি।
আমরা দুজন ট্রেনে বসে গল্প করছি। ও আমাকে বিভিন্ন জায়গার নাম বলে যাচ্ছে আর সঙ্গে বিয়ের আগের নানান গল্প করছে।
আমাদের সঙ্গে আমার দেবর ছিল। ও আলাদা বসেছিল।
আমি বই পড়তে খুব পছন্দ করতাম। তাই সঙ্গে বই নিয়েছি। সে জন্য হঠাৎ আমার স্বামী খুব রেগে গেল। বই রেখে দিলাম এবং কথা দিলাম আর কখনো বই পড়বো না।
এরপর আমার স্বামী জানতে চাইলো, আমি তাকে কতোটুকু ভালোবাসি।
বললাম, পরিমাপ করা যাবে না।

তারপর আমি জানতে চাইলাম, সে আমাকে কতোটুকু ভালোবাসে।
সে বললো, শতকরা পাচ ভাগ।
এতো কষ্ট পেলাম যে তার দিকে তাকাতে পারলাম না।
আরো জানলাম বিয়ের আগে আমার স্বামীর অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।
জীবনের এই নিষ্ঠুর সত্যটা জেনেছিলাম চলন্ত ট্রেনে। তাই এখন ট্রেনে ভ্রমণের কথা উঠলেই কষ্টে আমার বুকটা ফেটে যায়।
ঢাকা থেকে ফেরার পথে আরো কিছু বই নিলাম।
আবারও বইকে জীবন সঙ্গী করলাম।
আমার স্বামী আমাকে এখনো শতকরা পাচ ভাগ ভালোবাসে।
তাই বই আমার একাকীত্বের একমাত্র সঙ্গী।

চট্টগ্রাম থেকে

আমার বৌ

আমার তিনকুলে আপন বলতে তেমন কেউ নেই। গ্রামের স্কুল থেকে ক্লাস ফাইভ পাস করে ঢাকার ভালো একটি স্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হলাম ১৯৯২ সালের দিকে। বাসস্থান দূরসম্পর্কের চাচাতো ভাইয়ের বাসা। সেখানে তিনটি প্রাণের মাঝে আরো একটি অনাবশ্যক প্রাণের অস্তিত্ব বিড়ম্বনা, নাকি খুশির উদ্রেক করেছিল তা প্রাথমিক পর্যায়ে বুঝতে না পারলেও পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছিলাম।
না, তারা বিড়ম্বনার চেয়ে খুশিই হয়েছেন বেশি। কারণ তাদেরকে এখন আর বাজার করা থেকে শুরু করে ছোটোখাটো কাজে মাথা ঘামাতে হয় না।
এভাবেই চললো দীর্ঘ পাচটি বছর। আমি তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। সালটা ১৯৯৬। শিগগিরই আমার এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। এদিকে বলে রাখি, আমার চাচাতো ভাইয়ের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো। ঢাকায় নিজস্ব দোতলা বাড়ি আছে অভিজাত এলাকায়। বাড়িতে কাজের লোকজন সবই আছে।
কিন্তু সমস্যা হলো ভাবী কাজের জন্য পার্মানেন্টলি একজন মেয়ের খোজ করছিলেন। কিন্তু পাচ্ছেন না।
এদিকে আমার এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। বাড়িতে হুলুস্থুল অবস্থা। কারণ তখন আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল পড়ালেখায়।
ভাবী তখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন, যেমন করেই হোক একটি স্থায়ী কাজের মেয়ে জোগাড় করবেন।
যথাসময়ে বেশ ভালোভাবেই আমার পরীক্ষা শেষ হলো। এখন আমার হাতে বেশ সময়। সুযোগ পেলেই বই পড়ি। এখানে বলে রাখি, আমি আবার কখনোই *আওরতদের* (নারীদের) সংস্পর্শে যাই না। দুষ্টামিটা খুব কম করি। তাই ভাবী আমাকে এটা–ওটা বলে খেপান।
একদিন রুমে বসে বই পড়ছি।
ভাবী এসে বললো, নরসিংদী থেকে নাকি একটা কাজের মেয়ে জোগাড় করেছেন যে কি না আজ দুইটার ট্রেনে কমলাপুর পৌছাবে। ভাবী আমাকে মেয়েটিকে নিয়ে আসার জন্য বললেন।
সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হয়ে কমলাপুর স্টেশনে পৌছে দেখি বেশ কিছুক্ষণ আগেই মেয়েটি এসে দাড়িয়ে আছে মেয়েটির গ্রামের একজন লোকের সঙ্গে।
লোকটি মেয়েটিকে আমার হাতে তুলে দিয়ে তার কাজে চলে গেল।
এবার মেয়েটির দিকে চোখ তুলে তাকালাম। একি, এ কি করে সম্ভব? এমন একটি সুন্দর পরীর মতো মেয়ে কি না কাজ করতে এসেছে!

ঘোর কাটলো মেয়েটির কথায়।

কি হলো, যাবেন না?

মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গি, ভাষা সবই ভালো মনে হলো।

হ্যা, হ্যা চলুন।

সারা রাস্তায় মেয়েটির দিকে একবারও তাকাইনি। যদিও প্রথম দেখাতেই বুঝে ফেলেছিলাম মেয়েটির বয়স বারো তেরোর বেশি হবে না। তার সঙ্গে একটি কথাও হলো না। কারণ আমি যে *লজ্জার বাদশা* (ভাবীর দেয়া বহু ব্যঙ্গাত্মক উপাধির একটি)।

বাড়িতে এলে ভাবীর আনন্দ দেখে কে।

এদিকে হঠাৎ করেই বেশ কিছুদিন পর আমার রেজাল্ট বের হওয়ার ঘোষণা হলো। সারাক্ষণ টেনশন হচ্ছে। এমন সময় আমার রুমের দরজায় টোকা পড়লো।

দরজা খোলাই আছে।

তাকিয়ে দেখি আমাদের কাজের মেয়েটি দরজা আগলে দাড়িয়ে আছে। এই দীর্ঘ তিনটি মাসে যে ঘটনা ঘটেনি আজ তাই ঘটলো।

এখানে বলে রাখি, আমি সেই প্রথম দিনের পর আর কখনোই তার সঙ্গে কথা বলিনি। এবং দেখাও হতো খুব কম।

ভাবী আপনাকে ডাকছেন।

ঠিক আছে, আপনি যান, আমি আসছি।

ভাইয়া একটা কথা বলবো?

বলুন।

আপনি আমাকে আপনি সম্বোধন করেন কেন? এভাবে বলবেন না।

কেন?

কারণ এটি শোভন নয়। আমাকে তুই বা তুমি করে বলবেন। এছাড়া আমি বয়সেও আপনার অনেক ছোট।

দেখুন, আমি কখনোই অপরিচিত মেয়েদের এমন সম্বোধন করি না।

কি? আমি অপরিচিত! তিন মাস ধরে আছি। ভাবী-ভাইয়া আমাকে কতো আদর করেন। আর বাপীও তো (আমার ভাতিজা) আমি বলতে অজ্ঞান। শুধু আপনিই আমার সঙ্গে এমন আচরণ করেন।

দেখুন, আমার মনটা ভালো নেই। আজ রেজাল্ট বের হবে।

তাতে কি হয়েছে? আপনি অবশ্যই ভালো রেজাল্ট করবেন।

আপনি কি করে জানলেন?

হু, মেয়েরা, বিশেষ করে এতিম মেয়েরা অনেক কিছুই বুঝতে পারে। যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সে চলে গেল।

বিকেলে ভাইয়া যখন রেজাল্ট নিয়ে ফিরলেন তখন তার সঙ্গে ইয়া বড় কার্টনে প্রচুর পরিমাণ মিষ্টি দেখে বুঝলাম আমার রেজাল্ট নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে।

ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা করতেই ভাইয়া বললেন, পেছনের লোকগুলো সামলা।

পেছনে তাকিয়ে দেখি বিরাট বড় এক প্রেস বাহিনী।

পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই আমার রেজাল্ট সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন।

যাহোক, রাতে ঘুমাতে যাবো, এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো।

কি, বলেছিলাম না, আপনার রেজাল্ট ভালো হবেই।

প্লিজ ভেতরে আসুন।

না, আসবো না।

কেন?

আপনি আপনার ভাষার পরিবর্তন না করা পর্যন্ত আসবো না।

আরে আসুন তো। বলেই আমি ওঠে ওনাকে ধরে এনে আমার খাটে বসালাম। তার দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখে জল। আমি তো অবাক! তার মুখটা তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, কাদছেন কেন?

খুশিতে।

খুশিতে?

হু। কারণ আল্লাহ আমার মনের আশা পূরণ করেছেন। আমি চেয়েছিলাম আপনার মতো একজন মানুষকে আল্লাহ যেন কষ্ট না দেয়। আমি এর আগে মোট পাচটি বাসা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ...। বলে মেয়েটি কাদতে লাগলো।

আমি তার কাধে হাত রেখে তুলে ধরলাম। তারপর তার চিবুক ধরে মুখটা তুলে ধরতেই সে আমার বুকে ঝাপিয়ে পড়লো।

এভাবে কতোক্ষণ ছিলাম ঠিক মনে নেই। হঠাৎ বাড়ির লোকজনের কথা মনে হতেই তাকে ছেড়ে দিলাম।

সে তো লজ্জায় মরে যায় আর কি! তার লজ্জারাঙা মুখটি ছিল আমার চোখে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর রমণীর মুখ।

এ আমি কি করলাম! আমাকে মাফ করে দিন বলেই সে কাদতে লাগলো।

ছিঃ! কোনো বাজে কথা বলবেন না। আপনি যা করেছেন তা ঠিকই করেছেন। আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই। সে মিষ্টি হেসে বললো।

কি কথা?

আমি আপনাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি। আর আপনি?

তার আগে বলুন আমাকে কি আপনার দাদির বয়সী মনে হয়?

কেন বলুন তো?

তাহলে এমন আপনি আপনি করছেন কেন?

আমি তাকে কাছে টেনে বুকে নিয়ে বললাম, এই মেয়ে, ভালোবাসো আমাকে?

যাহ, ছাড়ুন। বলেই সে দিল দৌড়।

এভাবেই শুরু।

তারপর ভর্তি হলাম এইচএসসিতে। পড়ালেখার শত চাপের মাঝেও তার একটুখানি আদর, একটু দুষ্টামি, সামান্য অভিমান ছিল আমার পড়ালেখার অনুপ্রেরণা। সে যখনই একা হতো তখনই তার পেছনে গিয়ে চুপি চুপি তাকে জড়িয়ে ধরতাম।

সে কপট রাগ দেখিয়ে বলতো, এই, কেউ এসে পড়বে। আহ! ছাড়ো না।

এ এখনই এমন করছো। যখন বিয়ের পর সারাক্ষণ তোমাকে...।

সে আমাকে কথা শেষ করতে দেয় না। মারতে তেড়ে আসে।

আর আমি ফান করি। মাফ চাই। সে বলে, জি না জনাব। আমার এতো দয়ার শরীর না যে, বার বার ক্ষমা করে দেবো। বলো, আর কখনো বলবে আজে বাজে কথা, বলেই আমার কান ধরে।

বলবো।

কি! সে কপট রাগ দেখায়।

আরে বোকা মেয়ে, আমার বৌকে আমি আদর করবো না।

উহ! আমার কি যে হবে তখন। এখনই যা দুষ্টুমি করো।

কি আর হবে। আমার আদরে তোমার পেটে...।

যাও, তোমার সঙ্গে কোনো কথা নেই।

এভাবেই চললো ইন্টারমিডিয়েট লেভেল। আমাদের ভালোবাসার দুরন্ত ঘোড়াটা ছুটে চললো দুর্বার গতিতে।

ইন্টারমিডিয়েটেও দুর্দান্ত রেজাল্ট করে ভর্তি হলাম বুয়েটে। তখনই ঘটলো এক বিপত্তি। ভাবী আমার প্রাণেশ্বরকে বিয়ে দেয়ার পায়তারা করতে লাগলেন। আমি কৌশলে ভাবীকে ম্যানেজ করে বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখলাম।

ভাবী–ভাইয়া কোনো সন্দেহ করতেন না। কারণ তাদের দৃষ্টিতে সে ছিল শুধুই একজন...।

এরপর ২০০৩–এর শেষ দিকে যখন আমি পাস করে বের হলাম তখন আমার চিন্তা অনেকটা দূর হয়ে গেছে। পাসের সঙ্গে সঙ্গেই ভালো একটি চাকরি পেলাম। তারপর বৌয়ের অনুমতি (আমি তাকে এ নামেই ডাকতাম) নিয়ে ভাইয়া–ভাবীকে আমাদের সম্পর্কের কথাটা বলতেই ভাবী এবং ভাইয়া উভয়েরই জ্ঞান হারানোর জোগাড়।

এমন সময় হঠাৎ খেয়াল করলাম, সে পেছন থেকে সব শুনছে। আমি তার রুমে গিয়ে দেখি সে একটি কাগজে কি যেন লিখছে (এই বিদ্যাটা আমার শেখানো)।

পরে সে চলে গেলে আমি গিয়ে দেখি আমার বৌ লিখেছে,

এই, তুমি কেন আমার জন্য কষ্ট করবে। তার চেয়ে ভালো আমিই চলে যাবো।

ইতি–

তোমার ...।

সন্ধ্যার পর হঠাৎ খেয়াল করি সে ঘর থেকে চুপি চুপি বের হয়ে যাচ্ছে। আমিও তার পিছু পিছু রওনা হলাম এমনভাবে যেন সে আমাকে না দেখতে পায়।

তারপর সে চলে গেল কমলাপুর রেলস্টেশনে। স্টেশনে এসে একটি ফার্স্ট ক্লাস ক্যাবিন ভাড়া করে কৌশলে রেলগার্ডকে দিয়ে তাকে সেই ক্যাবিনে ওঠালাম।

রাত আটটায় গাড়ি ছাড়লো চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। ক্যাবিনের লাইট বন্ধ।

তার মৃদু কান্না শোনা যাচ্ছে।

আমিই নীরবতা ভাঙলাম।

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

জানি না।

তার মানে?

তার মানে সোজা। আমি জানি না।

মনে হচ্ছে কেউ আপনাকে খুব বড় কোনো কষ্ট দিয়েছে।

তারপর সে হু হু করে কাদতে শুরু করলো।

ট্রেন ছুটে চলেছে দুর্বার গতিতে।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না।

বৌ, তুমি আমাকে এভাবে একা ফেলে চলে যেতে চাচ্ছ? আমার জন্য তোমার এতোটুকুও কষ্ট হচ্ছে না।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে ওঠে দাড়ালো। কে? কে আপনি?

আমি লাইট জ্বালালাম।

তার বিস্ময় যেন কাটছে না। তারপর বিকট একটা চিৎকার দিয়ে আমার বুকে ঝাপিয়ে পড়লো।

টানা কতোক্ষণ কেঁদেছি মনে নেই।

তুমি আমাকে এতো ভালোবাসো! তার জিজ্ঞাসা।

কেন বৌ, বিশ্বাস হচ্ছে না?

হচ্ছে।

এই, একটি কথা। ভাইয়া-ভাবী আমাদের সম্পর্কটা মেনে নিয়েছেন। তারাই তো তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে কৌশলে পাঠালেন।

সত্যি?

কি ছুয়ে বললে তুমি বিশ্বাস করবে?

আমার মাথা। কিন্তু বৌ, আমার যে অন্য কিছু ছুতে ইচ্ছা করছে।

কি, আবার অসভ্যতা!

এর ঠিক তিন দিন পরে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। ফুলশয্যার রাতে যখন তার কাছে গেলাম তখন রাত দুইটা। আমি গিয়ে তার পাশে দাড়াতেই সে আমাকে সালাম করলো।

তাকে তুলে বললাম, বৌ, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

যাহ! বৌয়ের ছোট উত্তর। বলেই সে আমার বুকে মুখ লুকালো।

ততোক্ষণে আমার ঠোট জোড়া তার ঠোট জোড়ার ওপর স্থাপন করে ফেলেছি।

সে এখনো মাঝে মধ্যে আমাকে সেই দিনগুলোর কথা বলে। আজ আমাদের সুখের সংসার। সে আমাকে এবং আমি তাকে ছাড়া একটি মুহূর্তেও ভাবতে পারি না।

জানি, কেউ কেউ এর সত্যতা (কাহিনীর) নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, এটিই আমার জীবনের চরম সত্য। সত্যিই যে ট্রেন দিয়ে তার আগমন, সেই ট্রেনই আবার তাকে সরিয়ে দিচ্ছিল আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। সময়োচিত পদক্ষেপে সেই ট্রেনই তাকে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে এনেছে।

আমার এবং আমার দুষ্টু বৌয়ের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা।

রাত বারোটা। আর লেখা সম্ভব নয়। কারণ আমার মিষ্টি বৌটা আমাকে ডাকাছে। এখন আমি ট্রেন চালাবো।

নাম ঠিকানা প্রকাশ অনিচ্ছুক

কলকাতা আগ্রা দিল্লি

- হুমায়ুন

আমার স্বল্প পরিসর জীবনে বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরে ট্রেন ভ্রমণের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর মধ্যে ইনডিয়াতে রেল ভ্রমন নিয়ে কিছু ঘটনা প্রায়ই মনে পড়ে।

এক.

২০০১ সালের ডিসেম্বরে আমেরিকাতে বসবাসরত আমার খালু, খালা ও কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী আগ্রা, জয়পুর ও দিল্লি ভ্রমণের প্ল্যান করেন। ওনাদের সঙ্গে গাইড হিসেবে আমি। কলকাতা পৌছে *ফেয়ারলি হাউস* থেকে বহু কষ্ট করে টুরিস্ট কোটায় *যোধপুর এক্সপ্রেস*-এর টিকেট পেলাম। রাত বারোটায় ট্রেন আগ্রার পথে হাওড়া ছাড়লো। রাতে ঘুমানোর জন্য সুন্দর পদ্ধতি রয়েছে। দিনের বেলাতে মাঝের ও উপরের সিটগুলো গোটানো থাকে আর রাতের বেলা বা প্রয়োজনে খোলা হয়। আধো ঘুম, আধো জাগার মধ্যে শীতের রাত পার হচ্ছে। আসানসোল, বর্ধমান, ধানবাদ পেরিয়ে সকালে ট্রেন গয়াতে পৌছালো। ফ্রেশ হয়ে নাশতা সেরে দূর দিগন্তের দৃশ্য দেখছি। এরপর মোগলসরাই স্টেশনে আধঘণ্টার বিরতি। আবার ছুটে চলা।

কখনো ট্রেনের মধ্যে মুভ করছি, কখনো দরজায় দাড়িয়ে থাকা, কখনো কথার আড্ডার মাঝে বিশাল ভূখণ্ড দেখছি। *কূল নাই কিনারা নাই*। এতো বড় দেশ, তবুও অন্য দেশের ভূমির প্রতি ইনডিয়ার হায়েনার মতো দৃষ্টি। একে একে ফতেহপুর, এলাহাবাদ, প্রতাপগড়, রায়বারেলি, উনাত্ত, কানপুর, হাটওয়াহ, সিকোবাবাদ হয়ে আগ্রাতে পৌছালাম সন্ধ্যা সাতটায়।

আগ্রা, জয়পুর দেখা শেষে দিল্লি যাবার পালা। সময় স্বল্পতা ও দিল্লি যাবার ট্রেন সম্পর্কে খোজখবর না নিয়ে *পাঞ্জাব মেল*-এর অর্ডিনারি ক্লাসের টিকেট করলাম। মুম্বাই থেকে ট্রেনটি আগ্রা ও দিল্লি হয়ে পাঞ্জাব যাবে। আমরা দুজন পুরুষ, চারজন মহিলা।

বিকেল পাচটায় ট্রেন আসার পর দেখা গেল কিছু বগি ভেতর থেকে বন্ধ। কিছু বগি ইনডিয়ান সৈন্যে ভর্তি। অন্য বগিগুলো লোকে লোকারণ্য।

কিছু যাত্রী দরজা প্রায় বন্ধ করে রেখেছে যেন নতুন যাত্রীরা উঠতে না পারে।

আমরা প্ল্যাটফর্মে ছোটাছুটি করছি আর আল্লাহকে ডাকছি। কেউ আমাদের সুযোগ দিচ্ছে না। পাশাপাশি, ওঠার জন্য অন্য যাত্রীদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

এক সময় ট্রেন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো। এ সময় অবিশ্বাস্যভাবে আমরা চারজন মহিলাকে ব্যাগসহ কোনোভাবে দরজা পর্যন্ত উঠিয়ে দিলাম। আমরা তখনো প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনের গতি যখন একটু বাড়লো, আমরা দুজন পুরুষ কোনোমতে সিড়িতে উঠলাম। এবং বহু অনুরোধের পর দরজা পর্যন্ত পৌছালাম। সামনে যেতে পারছি না।

দরজার পাশে ছয়জন যাত্রী বহু কষ্টে দাড়িয়ে আছি। সঙ্গী মহিলারা জীবনে কখনো লোকাল বাসেও চড়েননি। অথচ অসাধ্য সাধন করলেন, সেটা ভাবছি। দিল্লি পৌছার পর নতুন কষ্ট। নতুন যাত্রীদের ওঠার চেষ্টা আর আমাদের নামার চেষ্টা।

দিল্লির দর্শনীয় স্থানগুলো দেখে কলকাতা ফেরার পালা। ৩১ ডিসেম্বর *হাওড়া স্পেশাল* সকাল সাতটায় দিল্লি ছাড়লো। সকাল থেকে শৈত্য প্রবাহ চলছে, পাশাপাশি তাপমাত্রা দুই তিন ডিগ্রি। কুয়াশার জন্য ট্রেন ধীরে চলছে। নানান স্থানে বিরতি। সময় পার হচ্ছে না। সূর্যের মুখ দেখা গেল না। ইনডিয়ান যাত্রীদের কাছে কম্বল, লেপ, বালিশসহ শীতের প্রস্তুতি। আমাদের কাছে শুধু সোয়েটার, জ্যাকেট ও চাদর রয়েছে যা এই পরিস্থিতিতে নগন্য।

অন্য যাত্রীরা আমাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এমন দীর্ঘ কষ্টের ভ্রমণ কখনো হয়নি। প্রচণ্ড শীতে সবাই কাপছি। রাত নয়টায় ঘুমানোর প্রস্তুতি। মাথার নিচে ব্যাগ দিয়ে সব উপকরণ গায়ে দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে শীতের সঙ্গে লড়াই আর ঘুমানোর চেষ্টা করছি। ট্রেনের গর্জনের সঙ্গে শরীরে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

বহুক্ষণ পর ট্রেন থামার শব্দ হলো। মোগলসরাই স্টেশন। সিট থেকে নিচে নামলাম। আশপাশে হই চই আর মিউজিকের শব্দ। রাত বারোটা পার হলো। নববর্ষকে বরণ করার উৎসব চলছে।

আধঘণ্টার বিরতি শেষে আবার যাত্রা শুরু। কখনো কল্পনাও করিনি বছরের শেষ দিনও রাত এবং নববর্ষের প্রথম প্রহর ভিন্ন দেশে, তীব্র শীতের মাঝে দীর্ঘ ট্রেন ভ্রমণে পার করবো। পাশাপাশি মোগলসরাই স্টেশনে থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন দেখবো। রাত ও সকাল পার হয়ে ঊনত্রিশ ঘণ্টা সময় নিয়ে ট্রেন কলকাতা পৌছালো।

দুই.

ইনডিয়ার সবচেয়ে বিলাসবহুল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত *রাজধানী এক্সপ্রেস*-এ ভ্রমণ করার হঠাৎ সুযোগ এলো। ২০০২-এর এপৃলে আমার ফ্রান্সে যাবার প্রোগ্রাম ঠিক হয়েছে। দিল্লি থেকে ফ্লাইট। আমরা চারজন যাত্রী।

বিকাল পাচটায় *রাজধানী* কলকাতা ছাড়লো। আসন গ্রহণের পর থেকেই চমকের পর চমক। ফ্রেশ হবার জন্য সবাইকে একটি বড় রুমাল দেয়া হলো। কিছুক্ষণ পর ঠাণ্ডা পানীয়। আধঘণ্টা পর বিকেলের নাশতা দেয়া হলো। হালকা মিউজিক চলছে আর রাজধানীর ঊর্ধগতিতে ছুটে চলা উপভোগ করছি।

সন্ধ্যার পর চা, বিস্কিট দেয়া হলো। রাত আটটার দিকে গাইড এসে জেনে নিলেন যাত্রীদের পছন্দের খাবার মেনু সম্পর্কে। নয়টার দিকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন হলো। খাবার শেষে দই দেয়া হলো।

এবার ঘুমানোর প্রস্তুতি। সবাইকে পরিষ্কার বিছানা, চাদর, কম্বল, বালিশ দেয়া হলো। অতীতের দিল্লি থেকে কলকাতাগামী ট্রেনের কষ্টের কথা ভাবছি।

ফ্রান্স যাবার প্রোগ্রাম ঠিক না হলে রাজধানীতে ভ্রমণ করার সুযোগ হয়তো হতো না। বিরতিহীনভাবে ট্রেন ছুটে চলছে। এক সময় ঘুমের রাজ্যে। ভোর রাতে ঘুম ভাঙার পর দেখলাম, গাইড প্রতি যাত্রীকে ফ্রি ইংরেজি পত্রিকা দিচ্ছে।

ফ্রেশ হবার পর নাশতা ও চা, কফি পর্ব সমাপ্ত হলো। এক সময় ঘোষণা হলো, ট্রেন দিল্লির কাছে পৌছেছে। শেষবারের মতো সবাইকে কোল্ড ড্রিংকস দেয়া হলো।

পনেরো ঘণ্টার বিলাসবহুল ভ্রমণ শেষে রাজধানী সকাল দশটায় দিল্লি পৌছালো।

তিন.

সবশেষে কলকাতার কথা লিখতে হয়। এক সময় কলকাতা কতো অনুন্নত ও পিছিয়ে ছিল! সেই কলকাতায় রয়েছে অত্যাধুনিক পাতালরেলের ব্যবস্থা দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত। গুলিস্তান মোড়ের মতো কলকাতার ধর্মতলায় এই এসপ্লানেড।

মাটির নিচে আরেক রাজ্য। উপরের বড় রাস্তায় শ শ যানবাহন চলছে। নিচে পরিষ্কার, ঝকঝকে প্ল্যাটফর্ম। কিছুক্ষণ পর পর দ্রুত গতিতে ট্রেন আসছে। টিকেট নেয়ার পর অটোমেটিক মেশিনের গেট পার হতে হয়। অটোমেটিকভাবে দরজা খোলা, বন্ধ হচ্ছে।

ট্রেনগুলো খুবই সুন্দর। বগির ভেতরে খুব সুন্দর ব্যবস্থা উন্নত দেশগুলোর মতো। ইংরেজিতে ঘোষণা করা হয় পরবর্তী স্টেশনের নাম, কোন পাশের দরজা দিয়ে নামতে হবে। কলকাতার দর্শনীয় এই এসপ্লানেড থেকে অসংখ্য মানুষ শ্যামবাজার, পার্ক স্ট্রিট, রবীন্দ্র সরণি, কালীঘাটে, টালিগঞ্জে যাতায়াত করে।

এক দশকেরও আগে কলকাতায় এই মেট্রোরেল চালু হয়। অথচ স্বাধীনতার এতো বছর পরেও আমরা ওই রকম রেল ব্যবস্থা পাইনি। আমরা আছি অতীতের কাদা ছোড়াছুড়িতে ব্যস্ত। কিছু লোক, গোষ্ঠির কারণে বাংলাদেশের লাভজনক রেল খাতটি বছরের পর বছর লোকসান দিচ্ছে।

এরপরও আমরা স্বপ্ন দেখি *রাজধানী এক্সপ্রেস* ও কলকাতার *মেট্রোরেল*-এর মতো রেল ব্যবস্থা বাংলাদেশে চালু হবে। বর্তমান জোট সরকারের প্রতি প্রত্যাশা থাকবে এই ধরনের প্রকল্পের কাজে হাত দেয়ার জন্য।

সোনাগাজী, ফেনী থেকে

সুবাকি

- ইশরাত জাহান মেরী

স্কুল জীবনে যখন জার্নি বাই ট্রেন রচনাটি পড়েছি তখন থেকেই ট্রেনে বেড়াতে যেতে খুব ইচ্ছে করতো। কিন্তু ইচ্ছে করলেও কোনো লাভ হতো না। কারণ বরিশাল যাতায়াতে কোনো ট্রেন ব্যবস্থা নেই। তাই পার্কে গিয়ে ট্রেনে চড়ে ইচ্ছে পূরণ করতাম। মানে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। এই আর কি!

কলেজে আমার এক বান্ধবী ছিল, নাম সুবাকি। ওর বাড়ি সিলেটে। সুবাকির বড় ভাইয়ের চাকরির বদলির সুবাদে ওর বরিশালে আসা। বড় ভাইয়ের বাসায় থেকেই ও পড়াশোনা করতো। সুবাকিকে বলেছিলাম আমার ইচ্ছার কথা। ফলে সুবাকি অনেকবার ওদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে ছিল। কিন্তু বাবা–মায়ের অনুমতির অভাবে যাওয়া হয়নি।

সুবাকির ভাই ওকে কমলাপুর পর্যন্ত পৌছে দিতো, তারপর ও একাই যেতো। সুবাকি আমাকে মাঝে মধ্যে ওর ট্রেন ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা বলতো।

একবার ওর পাশের সিটে একটি সুদর্শন ছেলে বসেছিল। সুবাকি খুব খুশি হয়েছিল। কারণ এতো সময় চুপ করে থাকতে ওর খুব বোরিং লাগতো। এখন আর তেমনটি হবে না। ছেলেটির সঙ্গে গল্প করতে করতেই সময় কেটে যাবে। কিন্তু ওর ভাবনায় এক সময় চিড় ধরলো যখন ছেলেটি খুব ভাব নিয়ে বসে রইলো।

ছেলেটি সুবাকি–কে পাত্তাই দিল না। সুবাকির মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ও মনে মনে বললো, আমি সিলেটি পুরী তোমার চেয়ে কোনো অংশেই কম নই। সত্যিই ও চোখে পড়ার মতো একটি মেয়ে ছিল।

যাই হোক। ছেলেটি যখন ভাব নিয়ে বসে রইলো তখন ও আর তেমন কথা বলার আগ্রহ দেখালো না। সুবাকি বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলো।

কিন্তু বিপত্তি ঘটলো কিছু সময় পরই। সেই সময়েই স্কিন টাইট প্যান্টের খুব প্রচলন ছিল। এখনো অবশ্য আছে। সুবাকি লক্ষ্য করলো, ছেলেটি নিচু হয়ে জুতোর ফিতে আটকাচ্ছে। ছেলেটির প্যান্ট এতো পরিমাণ টাইট ছিল, নিচু হওয়াতে প্যান্টে যে প্রেশার পড়েছে তাতে প্যান্ট ছিড়ে গেল। ব্যাপারটি সুবাকির চোখ এড়ালো না।

ছেলেটি বাকা চোখে সুবাকির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল সে মুচকি হাসছে। বেচারা তখন খুব লজ্জা পেল। এবং লজ্জা পাবারই কথা।

সুবাকি মনে মনে বললো, বেশি ভাব নিলে এ অবস্থাই হয়!

ট্রেন গন্তব্যে আসার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ছেলেটি মাথা নিচু করেই বসে ছিল।

ট্রেনে নিজের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় বান্ধবীর অভিজ্ঞতা নিয়েই লিখতে হলো। সুবাকির সঙ্গে এখনো আমার খুব ভালো সম্পর্ক। বর্তমানে চিঠি ও ফোনের মাধ্যমেই ওর সঙ্গে ভাবের লেন–দেন হয়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সেই সুদর্শন যুবকটির সঙ্গেই সুবাকি এখন একই ছাদের নিচে বসবাস করছে। কিছুদিন আগেও ওর হাসব্যান্ডকে মনে করিয়ে দিয়েছি ট্রেনের সেই কাহিনীর কথা।

ভাইয়া বলেন, আল্লাহর কাছে অনেক অনেক শুকরিয়া। সেদিন সেই ঘটনা না ঘটলে আপনার বান্ধবীকে হয়তো পাওয়া হতো না।

ওরা সত্যিই খুব সুখে আছে। সেদিন ট্রেন হয়তো ওদের দুজনকে এই ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে সহায়তা করেছিল।

ওরা যেন বাধা–বিপত্তি ছাড়াই গন্তব্যে পৌছাতে পারে এটাই সব সময়ের জন্য আমার কামনা।

কলেজ রোড, বরিশাল থেকে

ফার্স্টক্লাস

- দেলোয়ার হোসেন সরকার

ইনডিয়া সীমান্তে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলায় বিরল একটি প্রান্ত রেলস্টেশন। বিরল থেকে মাইল দেড়েক পূর্বে এবং দিনাজপুর থেকে মাইল চারেক পশ্চিমে মখলেসপুর একটি গ্রাম। এই মখলেসপুরে কিছুদিন

অজ্ঞাতবাস করছিলাম। সাধারণত দিনাজপুর থেকে নদী পার হয়ে পায়ে হেটেই সেখানে যাতায়াত করতাম। সেখানে আমার কাছে দুই সেট শার্ট, পাজামা, লুঙ্গি, গামছা, চাদরসহ নৈমিত্তিক ব্যবহার্য কিছু দ্রব্য ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমার বাকি কাপড়-চোপড় দিনাজপুর শহরে বন্ধু রফিকুল ইসলাম ঘুটু উকিলের বাড়িতে থাকতো। প্রয়োজন মতো সেগুলো ব্যবহার করতাম।

একদিন ক্লান্ত থাকার জন্য ভাবলাম হেটে না গিয়ে বিরলে গিয়ে ট্রেনে চড়েই যাই। বিরল থেকে দিনাজপুর মাত্র পনেরো বিশ মিনিটের রাস্তা। মাঝে একটি মাত্র স্টেশন কাঞ্চন। স্টেশন ঠিক না, বলা যায় হাফ স্টেশন। দিনাজপুর থেকে রেললাইনটি এসে এখানে দুই ভাগ হয়ে একটি গেছে বিরল, অন্যটি গেছে ঠাকুরগাও হয়ে পঞ্চগড়ে।

বিরল শেষ স্টেশন হওয়ায় ট্রেন এসে অনেক দেরি করে ইঞ্জিন ঘুরিয়ে তারপর ছাড়ে। আমি বিরল গিয়ে দেখি ট্রেন এসে গেছে। কিন্তু ইঞ্জিন ঘোরায়নি। ক্লান্তি দূর করার জন্য একটু আরাম করবো ভেবে একটি ফার্স্ট ক্লাস বগিতে উঠে শুয়ে পড়লাম। শ্রেণীটা প্রথম হলেও চেহারাটা আস্তাকুড়ের মতো। বাদামের খোসা, ছেড়া কাগজ, বিড়ির টুকরো ইত্যাদি আবর্জনা দিয়ে বগি ভর্তি।

যাহোক, কিছুক্ষণ পরে দুই ভদ্রলোক (?) একটা সাইকেল নিয়ে বগিতে উঠলেন। উঠেই আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন (সম্ভবত আমার পোশাক পরিচ্ছদ দেখে), টিকেট আছে?

বললাম, টিকেট তো করিনি।

অন্যজন বললেন, টিকেট করনি আবার ফার্স্ট ক্লাসে উঠে আছো? নেমে যাও! বলে আঙুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন।

কি আর করা! সুড় সুড় করে নেমে গেলাম।

আমি সাধারণত এই পথে থার্ড ক্লাসে ভ্রমণ করি। দশ পনেরো মিনিটের রাস্তা থার্ড ক্লাসে দরজায় দাড়িয়েই পার হয়ে যেতাম।

কিন্তু আজ সোজা গিয়ে একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট করলাম। তারপর গেলাম গার্ডের কাছে। বললাম, আপনার অভিযোগ বইটা একটু দিন তো!

গার্ড চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলো, কেন? কি হয়েছে?

বললাম, আমি ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট করেছি। কিন্তু বগিতে যা অবস্থা দেখলাম তাতে অভিযোগ না করে উপায় নেই।

গার্ড ধড়মড়িয়ে উঠে বললো, চলুন তো দেখি কি হয়েছে।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, আমি পাকিস্তান আমলের কথা বলছি।

গার্ড সব দেখে তৎক্ষণাৎ একটা ঝাড়ুদার দিয়ে সব পরিষ্কার করে দিল। তারপর বললো, এবার হয়েছে তো?

বললাম, পরিষ্কার অবশ্য হয়েছে। তবে ফার্স্ট ক্লাসে কি সাইকেল বুক করা হয়?

গার্ড আবার চমকালো এবং জিজ্ঞাসা করলো, সাইকেলটা কার?

ভদ্রলোকেরা বললেন, আমাদের।

গার্ড টিকেট দেখতে চাইলো।

দেখা গেল তারাও টিকেট করেনি। গার্ড কিছু মিষ্টি মধুর বাক্য প্রয়োগ করে তাদের নামিয়ে দিল।

বেচারারা মাথা নিচু করে সাইকেল নিয়ে নেমে গেল। এরপর একাই বগির একমাত্র যাত্রী হয়ে শুয়ে-বসে দিনাজপুর পৌছালাম। দিনাজপুর পৌছে দেখলাম লোক দুজন বেশ দূর দিয়ে প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করছে আর বার বার এই বগির দিকে তাকাচ্ছে।

রৌশনাবাগ, পঞ্চগড় থেকে

ইওরোস্টারে

- আলম আরা বেগম

বরাবরই ট্রেনে ভ্রমণ করার আনন্দটা অন্য রকম মনে হয় আমার কাছে। আন্তর্জাতিক রুটে প্লেনে বেশ কয়বারই ভ্রমণের সুযোগ আমার হয়েছে।

একবার সৌভাগ্য হয়েছিল বিশ্বখ্যাত সুপারফাস্ট ট্রেন *ইওরোস্টার*-এ ভ্রমণের। এই ট্রেন বিদ্যুৎ গতিতে চলে। ঘণ্টায় তিনশ কিলোমিটার পর্যন্ত যার গতি হতে পারে। লন্ডনের ওয়াটারলু স্টেশন থেকে শুরু হলো আমার সেই রোমাঞ্চকর ভ্রমণের। ওয়াটারলু স্টেশনে আমাকে একপাশে বসিয়ে রেখে বড় ভাই ট্রেন সংক্রান্ত একটু খোজখবর নিতে গেলেন।

চুপচাপ বসে না থেকে সামনে *বুটস*-এর মার্কেটে ঢুকে পড়লাম। ঢুকতেই উপমহাদেশীয় চেহারার একজন সম্ভবত আমার বাদামি চেহারা এবং পোশাক দেখেই স্বজাতি মনে করে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এসে উর্দুতে প্রশ্ন করলেন, *আপ ইনডিয়ান হ্যায় ?*

আমার সিনেমা দেখা হিন্দি বিদ্যা চালিয়ে দিলাম। *নেহি, ম্যায় বাংলাদেশি হু*।

ব্যস জমে উঠলো আলাপচারিতা। আফতাব বালুচ, পাকিস্তানি।

সে সময় ছিল রোজার মাস। সে আমাকে আপ্যায়নের আমন্ত্রণ জানাতেই বিনীতভাবে জানালাম, আমি রোজা আছি। তাতেও ছাড় নেই। আফতারি (ইফতারি) করে যেতে হবে। অন্ততঃ প্যারিস থেকে যেদিন ফিরি সেদিন যেন তার সঙ্গে *আফতারি* করে যাই। কথা তাকে দিতেই হবে।

চেষ্টা করবো বলে কথা দিয়েছিলাম। সে কথা রাখা হয়নি আজো। সেদিন কেন আফতাব বালুচ এতো আকড়ে ধরতে চাইছিলেন আমাদের সদ্য পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও? বাংলাদেশি হলেও কিছুটা যেন স্বাদেশির ছোয়া পাচ্ছিলেন? বহুদিন দেখা হয়নি কোনো স্বজনের মুখ? পেশার তাগিদে *বুটস*-এর সেলসম্যান হিসেবে কাজ করছেন দেশ-পরিজন ছেড়ে।

ইওরোস্টারে চড়ে দেখছিলাম কতো দ্রুত পাশ কেটে যাচ্ছে দৃশ্যপট। এতো দ্রুত ট্রেন যাচ্ছে, অথচ বিন্দুমাত্রও ঝাকি নেই। গাড়ি যেন চাকার ওপর পিছলে চলে যাচ্ছে।

মধ্য পথে প্রায় সাতাশ মিনিট ইংলিশ চ্যানেলের নিচে টানেলের ভেতরে দিয়ে ট্রেন পার হলো। অবাক বিস্ময়ে ভাবছিলাম কিভাবে এতো লম্বা পথ টানেল তৈরি করে তাতে আবার রেললাইন বসানো হয়েছে।

এ ট্রেনে অবশ্য রাজধানী এক্সপ্রেস-এর মতো আতিথেয়তা নেই। একবার সৎসামান্য আপ্যায়ন করা হয়েছিল। প্যারিস শহর, সাইকেল টাওয়ার, নতরদাম, আলমা টানেল (যেখানে পৃন্সেস ডায়নার দুর্ঘটনা ঘটেছিল) ঘোরা শেষে দেখতে পেলাম ভার্সাই নগরীতে ভার্সাই প্যালেস। অপূর্ব কারুকার্য খচিত ভার্সাই প্যালেসের দেয়াল জোড়া চিত্রকর্ম, ছাদের ভেতরেও চিত্রকর্ম দেখতে দেখতে মুগ্ধতার অবশেষে বিবশ শুধু নয়।

মধ্য নভেম্বরে প্যারিসের শীতের তীব্রতায়ও বিবশ হয়ে আসছিল হাত-পা। গাইড তরুণের নাম আলেস। তার প্রাণবন্ত বর্ণনায় শুনতে পাচ্ছিলাম রাজা পঞ্চম লুই, পেড়ল লুই, মাদাম পম্পিদুর কাহিনী। গিলোটিনে শিরচ্ছেদ করার রোমহর্ষক বর্ণনা। মনে হচ্ছিল যে, সব কাহিনী দেখতে পাচ্ছি নিজ চোখে।

এবার ফেরার পালা। আবারও ইওরোস্টার। বিশাল সুপারস্টোর *গ্যালারি দি লাকায়েত*-এর ভেতরে ভ্রমণের সুযোগ হলেও বিখ্যাত ফরাশি সুরভি ক্রয় ছিল নাগালের বাইরে। এবার রেলস্টেশন *গার দি নর্দ*-এর একটা *কিওস্ক* থেকে ত্রিশ ইওরোর বিনিময়ে দুটি ক্ষুদ্রাকৃতির সুরভি কেনার সুযোগ পেলাম। তাই নিয়ে মনের আনন্দে ইওরোস্টারে চাপলাম।

পথের দুপাশে আল বিহীন ক্ষেতের বিস্তীর্ণ সবুজ দেখতে দেখতে পৌছালাম লন্ডনের ওয়াটারলু স্টেশনে। আসার পথে মনে পড়লো আফতাবকে দেয়া প্রতিশ্রুতি। বড় ভাইয়ের তাড়ায় দাড়াতে পারিনি কোথাও। তবু দুচোখ দুপাশে খুজেছি আফতাবকে। না, পাইনি তার দেখা।

আজো চোখের সামনে ভেসে ওঠে আফতাব বালুচের মুখ। হয়তো এতো দিনে তিনি থিতু হয়েছেন লন্ডনের বুকে। পেয়েছেন স্বজনের সান্নিধ্য। যেখানেই থাকেন আফতাব বালুচ, ভালো থাকবেন! একদিন নিশ্চয়ই ইফতারি করবো আপনার সঙ্গে।

কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ থেকে

কাপুরুষ

- এস ও এস

আমি বহু ধরনের ট্রেনে অসংখ্যবার ভ্রমণ করেছি। নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন বরোর কনি–আইল্যান্ড বা বে–রিজ স্টেশন থেকে যাত্রা করে ম্যানহাটান হয়ে যে *এন* (N) অথবা *ডাবলিউ* (W) ট্রেন দুটি কুইন্সবরোর এস্টোরিয়া ডিটমাস পর্যন্ত যাতযায়াত করে সে দুটি ট্রেন বা সাবওয়ে (মাটির নিচ দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনকে আমেরিকানরা সাবওয়ে বলে) ফরটি সেকেন্ড স্ট্রট বা বিখ্যাত টাইমস স্কোয়ার ধরে 37, 49, 51, 59 বা ফিফথ এভিনিউ এবং লেকসিংটন স্টেশন থেকে ডুব মেরে ইস্ট রিভারের পাতালের মাটি ফুড়ে ছুটে এসে কুইন্সবরো প্লাজা জাংশনে উঠে আসে। প্রথমে মাটিতে, তারপর মাটির ওপরে লোহার ভারী পাত দিয়ে তৈরি প্রায় পচিশ ফিট উচু স্টেশনে। এই স্টেশনের এক ধাপ দিয়ে উপরের গাড়ি পুবে যায় (প্ল্যাটফর্মের দুই পাশ দিয়েই), নিচের ধাপ দিয়ে যায় পশ্চিমে ম্যানহাটানের দিকে।

এন বা ডাবলিউ ট্রেনের অর্ধেক যায় কনি–আইল্যান্ড পর্যন্ত এবং অর্ধেক যায় বে–রিজ পর্যন্ত। এখানেই আরম্ভ হয়েছে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ ভেরাজানো ন্যারো বৃজ। এই বৃজটি একটি ঝুলন্ত বৃজ। উত্তর সীমায় ব্রুকলিন বরো (নিউ ইয়র্ক সিটির পাচটি বরোর একটি)। পশ্চিমে স্ট্যাটেন আইল্যান্ড। মাঝখানে হাডসন রিভার। একটু দূরেই যার সঙ্গমস্থল আটলান্টিকের সঙ্গে। এই হাডসন রিভার দিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজ ইওরোপ, আফৃকা, এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য থেকে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানের শেষ মাথা যার নাম সাউথ ফেরি অথবা নিউ জার্সির বিভিন্ন বন্দরে ভেড়ে। কতোগুলো বড় জাহাজ ডিপ সিতে নোঙর করে মাল খালাস করে থাকে। এসব উচু অবজারভেশন টাওয়ারওয়ালা জাহাজ অনায়াসে ভেরাজানো (Verazano) বৃজের তলা দিয়ে যেতে পারে।

আমরা যখন কলেজে পড়ি সেই ১৯৬৪ সালে তখন এ বৃজটি তৈরি হয় এবং তখন এটিই ছিল পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘ ঝুলন্ত বৃজ। বর্তমানে ইংল্যান্ডের *হাম্বার বৃজ* পৃথিবীর দীর্ঘতম। বৃজটি ব্রুকলিন দিকের তীর থেকে প্রায় আধা মাইল বা তারও বেশি পানির ভেতরে হাডসন নদীর পশ্চিম পাশের আরেকটি অনুরূপ টাওয়ার থেকে টানা মোটা রাশিতে ঝোলানো। নদীর উভয় তীরের স্থলভাগ থেকে এপ্রোচ রোডের শেষ মাথায় অবস্থিত বিশাল আকৃতির দুটি স্তম্ভের ভেতর রশি থেকে বৃজের মোটা রশি টাওয়ার দুটির ওপর দিয়ে ঝুলে আছে। এই গজারি গাছের মতো মোটা রশি থেকে বাশের মতো মোটা রশি নেমে মূল সেতুটিকে ঝুলিয়ে রেখেছে। গরমে রশি লম্বা হয়ে যাওয়ার ফলে গ্রীষ্মকালে সেতুটি বারো ফিট নিচে নেমে আসে।

বৃজটি চওড়ায় কতো ফিট হবে জানা নেই। তবে পাচশ ফিটের কম হবে না। সেতুটি দুই লেনের। নিটের ডাবলওয়ে লেন দিয়ে যেমন ট্যাকসি, বাস, লড়ি, বত্রিশ চাকার কভার্ড ভেন ও অন্যান্য গাড়ি চলে (রেললাইন নেই), উপরের অনুরূপ লেন দিয়েও একই ধরনের গাড়ি চলাচল করে (উভয়মুখে)। নিচু থেকে দেখলে বোঝা

যায় না যে সেতুর ওপর দিয়ে একটি পাচশ ফিটের হাইওয়ের উপরে নিচে একই প্রশস্তের আরেকটি দ্বিমুখী হাইওয়ে আছে।

হাডসন নদীর তীর ধরে ঢেউ থেকে মাটি রক্ষার জন্য বিশ পচিশ মণ ওজনের পাহাড়–ভাঙা পাথর ফেলা হয়েছে। নদীর তীরের সুউচ্চ মাটি রক্ষা করা হয়েছে চওড়া ওয়াল দিয়ে। তার পাশ দিয়েই বয়ে গেছে ওয়ানওয়ের একশ ফিটের কার্পেট করা রাস্তা। রাস্তা রক্ষা দেয়ালের দক্ষিণ পাশ ঘেষে ফেলা বড় বড় পাথরে বসে সৌখিন শিকারিরা দলে দলে মাছ ধরছেন বড়শি দিয়ে। তীরের রাস্তা থেকে সেতুর উচ্চতা প্রায় তিনশ ফিট হবে। দুই পিলারের ব্যবধান চার হাজার দুইশ ষাট ফিট। এবং প্রতিটি টাওয়ারের ওজন সাতাশ হাজার টন। সেতুটি প্রথম ইওরোপিয়ান নাবিক জিওভান্নি ডি ভেরাজানো যিনি ১৫২৪ সালে নিউ ইয়র্ক এক্সপ্লোর করেন তার নাম অনুসারে রাখা হয়।

যাক সে কথা। এবার বাংলাদেশে ট্রেন ভ্রমণের একটি গল্প।

১৯৭৩ সাল। তখন আমি একজন তরতাজা যুবক। চাকরি করি একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে।

একবার অফিসের প্রয়োজনে ঢাকা যেতে হলো। ওই জেলা থেকে ঢাকা আসার একমাত্র উপায় ট্রেন। অবশ্য তখনো বিকল্প বাহন ছিল বিমান। ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। সেকেন্ড ক্লাস কি ফার্স্ট ক্লাসের বগিতে উঠেছি মনে নেই। এটুকু শুধু মনে আছে, এক বগিতে আমরা চারজন, দুই দম্পতি। ডানদিকের বার্থ এবং নিচের সিটে আমাদের দুজনের শোয়া–বসার ব্যবস্থা। বাম দিকের বার্থ এবং নিচে আমাদের চেয়ে কম বয়সী এক নববিবাহিত দম্পতির। স্বামী যেমন সুপুরুষ, স্ত্রীটিও তেমনি ইরানি রমণীর মতো। হাল্কা শরীর। তবে খুবই ভারী বক্ষ। পড়নে শাড়ি। গায়ে জামদানির কাজ করা ব্লাউজ।

গাড়ি ছাড়ার পর আমরা তাদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তাদের বিয়ে হয়েছে বেশি দিন হয়নি। স্বামী লন্ডনি। তারা উভয়েই লন্ডনে চলে যাবেন। তাই ঢাকা যাওয়া।

স্বামীর তুলনায় মহিলাকে খুবই স্মার্ট ও আলাপি মনে হলো। মহিলা আমার সঙ্গেই বেশি কথা বললেন। মনে হলো এতোদিনে তার মনের অর্গল যেন খুলে গেছে।

রেলগাড়ি তার আপন মর্জিতে চলছে। আমার তাতে খারাপ লাগছে না। একজন চৌধুরীর বৌকে (তার অবয়ব থেকে অনুমিত) এতো কাছ থেকে দেখতে পেয়ে এবং এতো অল্প পর্যায় মনে খুবই আনন্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল গাড়ি অনন্তকাল চলুক। গন্তব্যে যেতে শত বছর পার হয়ে যাক। আমার এতোটুকু ক্লান্তি আসবে না।

ইতিমধ্যে গাড়ি কুলাউড়া জাংশন স্টেশনে পৌছালে আমার গিন্নি ঘুমে কাতর হয়ে পড়ে। তাকে বার্থে তুলে দিয়ে বুকে একটা বাধার দেয়াল চাপা থেকে মুক্ত হলাম।

রেলগাড়ি ভ্রমণ আমার কাছে সর্বদাই উপভোগ্য। দ্রুতবেগে গাড়ি শহর ছেড়ে গ্রামগঞ্জে যখন প্রবেশ করে তখন দুই পাশের ক্ষেত–খামার, মাঝে মধ্যে ছোট সেতু ও কালভার্ট পার হওয়ার শব্দ আমাকে একটা আলাদা জগতে নিয়ে যায়। এর আগে সিলেট এবং চট্টগ্রাম ভ্রমণ করেছি অনেকবার।

নরসিংদী পেরোলে ভৈরবের মেঘনা সেতু পর্যন্ত কয়েকটি ছোট এবং মাঝারি নদী পার হতে হয়। নদীগুলোর সম্ভবত একটি শীতলক্ষ্যা, একটি ব্রহ্মপুত্র, আরেকটি মেঘনার শাখা হবে। ওই সেতুগুলোর ওপর দিয়ে যখন গাড়ি যায়, আমি উঠে জানালার পাশে আসি। নদীগুলো দেখি। নদীর ওপর ভেসে চলা পাল তোলা নৌকা, কখনো মাছ ধরার দৃশ্য দেখি। তাছাড়া লোহার সেতুর ওপর দ্রুতগামী ট্রেন উঠলে একটা খটর খটর মেটালিক শব্দ হয় যেটা ক্ষণিকের জন্য সম্পূর্ণ নতুন। তখন মাথা বের করে প্রাণ ভরে কুল কুল বয়ে যাওয়া শান্ত ব্রহ্মপুত্রের পানি দেখি। সে দৃশ্য আমাকে সব ভুলিয়ে দেয়।

আমার এ ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখলে আমার সহধর্মিনী সঙ্গে থাকলে, ভীষণ বিরক্ত হয়।

ট্রেন ভৈরব সেতুর ওপর উঠলে আমার কেমন যেন একটা ডানামেলা সোনালি ঈগলের অনুভূতির ভূত আমার সর্বচেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলতো। তাই দিনে তো নয়ই, রাতেও কোনোদিন ট্রেনে ঘুমিয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না।

কিন্তু মুশকিল হলো আমার সহযাত্রীদের নিয়ে। বিশেষ করে ইরানি রমণীর অপূর্ব আভা আমাকে এক বিচিত্র আনন্দ দিচ্ছিল। বলতে দ্বিধা নেই, আমার স্ত্রী আবার একাদশীর চাদ। সে তুলনায় সে ছিল পূর্ণিমার চাদের চেয়ে শতগুণ উজ্জ্বল। কিন্তু নির্লজ্জের মতো সম্পূর্ণ চোখ মেলে বসে থাকি কি করে? তাই দেয়ালে ভর দিয়ে ঘুমের ভান করছি আর আধখোলা চোখে সহযাত্রিনীর বুক ও মুখের দিকে লক্ষ্য রাখছি। এমন সময় লক্ষ্য করলাম এক আশ্চর্য দৃশ্য।

মহিলার স্বামী ঘুম বেহুশ। তার কোলে স্ত্রীর মাথা। হঠাৎ মহিলা নড়েচড়ে বসলো এবং গরমে তার আটসাট আধভেজা ব্লাউজ ও ব্রা শরীরকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছিল এমন একটা মৃদু আওয়াজ করে পেছনে হাত দিয়ে হুক খুলে ব্রাটি খুলে ফেললো। এবং ব্লাউজটির বোতাম খোলা রেখে পাতলা শাড়ির আচল দিয়ে বুক ঢেকে রাখলো।

এতোক্ষণ অবশ্য সম্পূর্ণ পথই শাড়িতে তার সম্মুখভাগ আচ্ছাদিত ছিল। ব্রামুক্ত হয়ে তার সুপুষ্ট উদ্ধত দুই বুক সামান্য নিচে নেমে আসে। আধভেজা ফিনফিনে শাড়ি লেপ্টে লেগে আছে তার শরীরে। আধো আলোতেও তার আনারকলির মতো দুই নিপলের অবস্থান বোঝা যাচ্ছিল। আমার চোরা চোখ কিছুতেই ফেরাতে পারছিলাম না সে দুর্লভ দৃশ্য থেকে।

মেয়েদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে বলে শুনেছি। সে যে আমার বেহায়াপনা তার চতুর ছলনামীয় ঘুমের ভান করা চোখে দেখছিল তা বোঝা যাচ্ছিল তার কিছু কিছু নড়াচড়াতে।

এর মধ্যে তার হাত থেকে কি একটা নিচে পড়ে গেল। অথবা সে ইচ্ছা করেই ফেলে দিল। সম্ভবত চুলের কাটা অথবা ক্লিপ হবে। সে তা খুজতে ট্রেনের মেঝেতে উপুড় হতেই তার শাড়ির আচল মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো। মনে হলো সে যেন ইচ্ছা করেই কাজটি করলো। জিনিসটি খুজে নিয়ে সে আবার তার স্বামীপ্রবরের বুকে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমের ভান করলো। বুক শাড়ি ও ব্লাউজ বিহীন। বোতাম খোলা ব্লাউজের দুই প্রান্ত কোথায় গিয়ে লুকিয়ে আছে দেখা যাচ্ছে না। এবার তার মাখন কোমল এটম বোমা দুটি রেলের ঝাকুনিতে ঢেউ খেলছিল। কামরার এক কোণে খুব কম পাওয়ারের লাইট। তবু সেই মৃদু আলোয় সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ভাবলাম হয়তো ঘুমে আচ্ছন্ন বুকের মৃদুমন্দ আন্দোলন তার ঘুমের গভীরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই শরীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেহুশ। আমার স্ত্রী এ ব্যাপারে খুবই হুশিয়ার। তার শরীরের কাপড় একটু এদিক–ওদিক হলে ঘুমের মধ্যেও সে জেগে যায়।

অপলক চোখে ঘুমের ভান করে তাজমহলের চূড়ায় পূর্ণিমার আলোর মতো ঝলমল দৃশ্য দেখছি।

এভাবে ঘণ্টাখানেক চলার পর হঠাৎ তার স্বামী জেগে উঠলেন। বৌয়ের এ আলুথালু বেশ দেখে তার তেমন কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। মনে হলো যেন এটা স্বাভাবিক একটি ঘটনা। সে তার ঝুলে পড়া আচলটি দিয়ে বৌয়ের দুই বুক ঢেকে দিল। জামার বোতাম খোলাই থাকলো। তারপর আবার পরম নিশ্চিন্তে আগের মতোই রেলের দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সত্যি বলতে কি, আমার বৌয়ের বক্ষও কোনোদিন এমন মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। সে তো *ঘর কা মুরগি ডাল বরাবর*। আজ যা দেখছি তা অভূতপূর্ব।

কিছুক্ষণ পর স্বামীপ্রবর উপরের বার্থে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি তো তার স্বামীর নড়াচড়া দেখে মরার মতো পড়ে আছি। কিছুক্ষণ পর মনে হলো বধূটি আবার ইচ্ছা করেই সিটের বাইরে একটু উপুড় হলো। আবার তার আচল উধাও।

এবার ভালো করে তার চোখের দিকে তাকালাম।

সে মুচকি হাসলো।

ভয়ে আমার আত্মারাম খাচাছাড়া। কারণ এমন দুঃসাহসিক কাজ কোনোদিনই আমার দ্বারা হয়নি। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো লুকিয়ে লুকিয়ে এমন অপরূপ দৃশ্য দেখে ফেলার লজ্জায়। এরপর পুব আকাশে শিশু সূর্যের আভা ফুটে উঠলো।

আমি এখন নিখাদ ভালো মানুষ সেজে উলটা দিকে মুখ করে শুয়ে রইলাম।

ভোরের আলোয় আমার গিন্নি জেগে উঠেছে। মহিলা তার বেশভূষায় নিষ্পাপ নারী হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলাম তারও সারা রাত নির্ঘুম কেটেছে এক ভীতুর ডিমকে খেলা দেখাতে দেখাতে।

কমলাপুর টিকেট চেকারের গেট পার হবো। প্রচণ্ড ভিড় ও দুই কাধে দুই ব্যাগের চাপে পেছনে পড়ে গেছি। আমার গিন্নি চেকারকে *টিকেট আছে* বলে আমার অনেক আগেই গেট পার হয়ে গেছেন।

পেছনে তাকিয়ে দেখি সেই মহিলা আসছেন। অনেক পেছনে তার স্বামী। হাতে ঢাউস সুটকেস।

গেট পার হয়ে বৌকে খুজছি। এমন সময় মহিলা দ্রুত এসে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলে গেলেন, *কাপুরুষ*।

এ কথাটি গত ঊনিশ বছরেও ভুলতে পারিনি। মনে মনে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন কা বিশেষণহীন পুরুষ হতে পারিনি।

মানিলিনগর, ঢাকা থেকে

কারাভোগ

- এম শরীফ

নদী ভাঙনে পতিত আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে প্রায় পচিশ বছর যাবৎ শহরবাসী। প্রথমে ঢাকা এসে এক নিকট আত্মীয়ের সূত্রে গোপীবাগ রেলক্রসিংয়ের পাশেই সপরিবারের বসবাস শুরু করি। শুরুর দিকে সময়-অসময়, গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় দূর থেকে ছুটে আসা ট্রেনের গগন বিদারী হুইসল খুব অসহ্য মনে হতো। তারপর থেকে ধীরে ধীরে মেগাসিটির মেগা হর্নের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি অত্যন্ত অসহায়ের মতো।

ছোট বেলা থেকেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য বা ঘটনা দেখার মতো বোধশক্তি তুলনামূলক কম। রক্ত, দুর্ঘটনা দেখে একাধারে কিছুদিন স্বাভাবিক খেতে, চলতে সমস্যা হতো। অজ্ঞান হয়ে যেতাম, চোখের সামনে অনেক দিন স্মৃতি ভেসে উঠতো।

মা বলতেন, আমার নাকি দুর্বল পুরুষ (প্রাণ) শক্তি।

হাই স্কুলে পড়ার সময়ে জীবনে সর্বপ্রথম ট্রেনে কাটা অবস্থায় একটি লাশ দেখে ভেবেছিলাম, মানুষ সবচেয়ে নিজের জীবনকে যদি বেশি ভালোবাসে তাহলে জীবনের প্রতি কতো বীতশ্রদ্ধ হলে সে আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারে। বুঝতে পারি, জীবন পাতার জটিল অংক মেলাতে না পেরে কেউ কেউ রাগ, ক্ষোভ, অভিমান, ব্যর্থতায় প্রিয় জীবন বিসর্জন দেয়ার মতো রাস্তা বেছে নেয়।

তবে ব্যক্তি ভাবনায় উপলব্ধি করি, সকল ঘাত-প্রতিঘাত, প্রতিবন্ধকতার মাঝেও একজন মানুষের বেচে থাকার মাঝেই আনন্দ, পরম তৃপ্তি। কবির ভাষায়, *দুঃখকে স্বীকার করো না, বাচার আনন্দে বাচো।*

রেললাইন সংলগ্ন এলাকার আশপাশে বেশ কয় বছর থাকার সুবাদে কয়েকটি আত্মহত্যা প্রত্যক্ষ করেছি, শুনেছি। এদের মধ্যে কেউ কেউ দেনার দায়ে, কেউ সংসারের ঘানি টানতে হিমশিম খেয়ে, ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকা আবার সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া স্রেফ অভিমানে রেলের নিচে মাথা দিয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করেছে। নানান প্রেক্ষাপটে বিচিত্র করুণ কাহিনী।

আমাদের আবাসস্থল থেকে কাছাকাছি ছিল কমলাপুর রেলস্টেশন। তাই অবসরে রেললাইনের আকা-বাকা পথ ধরে ছন্দময় গতিতে স্টেশনে চলে যেতাম। খুব এনজয় করতাম। তবে স্টেশনের চারপাশের খুপরিবাসী অপ্রাপ্ত বয়সী ছেলে-ছোকরাদের রেলযাত্রীর ভারী বোঝা বইতে দেখে মনটা খারাপ হয়ে যেতো।

১৯৮২ সাল। ট্রেনে তখনো ভ্রমণ করা হয়ে ওঠেনি। তবে বইয়ে পড়েছি, মানুষের কাছে শুনেছি বিনা টিকেটে রেল চড়লে জেল-জরিমানা ভোগ করতে হয়।

মাঝে মধ্যে স্টেশনে ঢুকে পত্রিকা পড়তাম, আনমনা হয়ে বসে থেকে অগোছালো ভাবনা করতাম। কখনো কখনো দুই একটা গল্পের বই কিনে বাসায় ফিরতাম।

স্টেশনের আসা-যাওয়ার ব্যাপারটি অবারিত, সর্বসাধারণের উন্মুক্ত বলেই মনে করে চঞ্চলচিত্তে ট্রেনে ওঠানামা যাত্রীদের মাঝ দিয়েই অনেক সময় আসা-যাওয়া করতাম।

একদিন চট্টগ্রাম থেকে আসা একটি ট্রেন থেকে নেমে বের হওয়া যাত্রীদের সঙ্গে আমিও বের হচ্ছিলাম। তবে সেদিন ট্রেনে কর্মরত কর্মচারী, কর্মকর্তাদের মাঝে তৎপরতা লক্ষ্য করি। ব্যস্ততা, দৌড়াদৌড়ি, ফিশফিশানি একটু বেশি মাত্রায়। স্টেশনে মোবাইল কোর্ট বসেছে বলে শুনলাম। চেক হচ্ছে।

এক কর্মচারী আমাকে আটকিয়ে দিল। স্টেশনে আলাদা একটি রুমে নিয়ে গেল। কর্তৃপক্ষের ধারণা, আমি বিনা টিকেটে রেলে চড়ে ঢাকার বাইরে থেকে এসেছি।

আমি একজন ছাত্র, স্টেশনে যাওয়া-আসা রুটিন ওয়ার্ক এসব সত্য বলেও সেদিন কাউকে বিশ্বাস করাতে ব্যর্থ হয়েছিলাম।

স্টেশন এলাকার সুরক্ষিত এলাকা দিয়ে চলাফেরা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই বলেই সেদিন আমার জীবনে সমস্যা হয়। নামমাত্র কিছু টাকা ছিল পকেটে। তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই একদিন একরাত জেল খেটে বাসায় ফিরতে হয়।

একা ছিলাম বলেই বাসায় কাউকে খবরটি পাঠানো যায়নি। বাসার সবাই পরে আমার কাহিনী শুনে রসিকতা ও হাসাহাসি করেছিল। আমার বোকামি ও অসচেতনতা নিয়ে মেলা কথা বলেছিল।

টংগিবাজার, গাজীপুর থেকে

ইনডিয়ান রেলওয়ে

- সীমা টসকানো

ছোটবেলা থেকেই আমার বাবার মুখে ইনডিয়ার গল্প শুনতাম আর মনে মনে শুধু স্বপ্ন দেখতাম ইনডিয়া যাওয়ার।

সেই স্বপ্ন আমার বাস্তবে রূপ নিল ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে।

আমি, আমার স্বামী এবং একমাত্র মেয়ে আমরা তিনজন প্রথমবারের মতো রওনা দিই ইনডিয়ার উদ্দেশ্যে।

কলকাতা পৌছেই আমরা প্রথমেই ট্রেনের টিকেট সংগ্রহ করতে চলে যাই রেলওয়ের টুরিস্ট কাউন্টারে। অনেক আশা করেছিলাম রাজধানী এক্সপ্রেসে চড়বো। কিন্তু রাজধানী এক্সপ্রেস তো দূরের কথা, অন্য কোনো ট্রেনেরই টিকেট পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক খোজাখুজির পর একটি স্পেশাল ট্রেনের টিকেট পাওয়া গেল। তখন পূজার সময়ে এই ট্রেনটি স্পেশালভাবে দেয়া হয়ে ছিল। ট্রেনটি ছিল বিভিন্ন বগি দিয়ে জোড়াতালি দেয়া।

আমরা হাওড়া গিয়ে সন্ধ্যা সাতটার সময় ট্রেনে চেপে বসলাম। ট্রেনটি যখন দিল্লির উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিল তখন আমরা সবাই আনন্দে আত্মহারা। আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশের পাচজনের আরেকটি পরিবার ছিল।

সবাই মজা করে ভেলপুরি খাচ্ছি আর গল্পগুজব করছি।

এর মধ্যে যখন রাত বাড়ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও বাড়ছিল। আমরা সবাই শুধু যার যার সোয়েটার ও জ্যাকেট নিয়েছিলাম। ইনডিয়ানদেরকে দেখলাম সবাই বাসা থেকে নিয়ে আসা খাবার খেয়ে নিচ্ছে আর কম্বল মুড়ি দিয়ে যার যার সিটে শুয়ে পড়ছে।

কিন্তু এদিকে তো আমাদের পেটও ক্ষিধেয় চো চো করছে।

স্টেশনে ট্রেন থামছে। কিন্তু কোনো খাবারই মিলছে না। আমরা শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা করছি। অনেক রাতে এক আলুপুরিওয়ালা উঠলো। উপায় নেই দেখে ওইগুলোই কিনে আমরা সবাই পেট পুরে খেয়ে নিলাম। এর মধ্যে শীত বাড়ছে আর বাড়ছে। আমরা সবাই শীতে কাপছি। সোয়েটার, জ্যাকেট গায়ে দিয়েই সবাই শুয়ে পড়লাম।

আমাদের অবস্থা দেখে ইনডিয়ানরা অবাক হয়ে তাকাচ্ছিল আর জিজ্ঞাসা করছিল আমরা কম্বল, বালিশ নিয়ে আসিনি কেন? যখন শুনলো আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি তখন কিছুটা করুণার দৃষ্টিতে তাকালো।

ঠাণ্ডায় আমাদের কারো চোখেই ঘুম আসছিল না। তাই সবাই কিছুক্ষণ পর পর চা, কফি খাচ্ছিলাম।

শীতে কাপতে কাপতে রাতটি কোনো রকমে পার করলাম। সারা দিন খেতে খেতে, গল্প করতে করতে আবার রাত হয়ে এলো। ট্রেন পৌছানোর কথা সন্ধ্যা সাতটায়। কিন্তু সেই ট্রেন দিল্লি গিয়ে পৌছালো রাত নয়টায়।

তিন দিন দিল্লিতে থেকে দিল্লি শহর, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন ঘুরে এক রাতে আমরা ব্যাংগালোরের ট্রেনে চেপে বসলাম।

এবার আমরা স্টেশন থেকে তিনটি এয়ার বালিশ কিনে নিলাম। আবারও সেই ঠাণ্ডা। রাতে সবাইকে কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমাতে দেখে আমার তো দুঃখে–কষ্টে চোখ ফেটে পানি এসে যাচ্ছিল।

সকাল হলেই আবার ঠাণ্ডার দুঃখ ভুলে যাই।

একই বগিতে কতো রকম লোক। কতো রকম ভাষা। তাছাড়া বাইরে তাকালে অপরূপ সব দৃশ্য। উচু, নিচু, পাহাড়, মাঠকে মাঠ সূর্যমুখির বাগান। মনে হয় যেন হলুদের রাজ্য। এসব দেখতে দেখতে সারা দিন কেটে যায়।

ট্রেনের খাবারগুলোও খুব মজার এবং আমাদের কাছে তো একেবারেই নতুন। ইডলি, দোসা, আলুর চপ, এগ বিরিয়ানি আরো নাম না জানা কতো যে খাবার।

আমার স্বামী আবার খুব ভোজন রসিক। সে সব রকম খাবারই কিনে কিনে খাচ্ছিল এবং আমাদের খাওয়াচ্ছিল।

ওই ট্রেনে আমরা দুই রাত থাকার পর পরদিন বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ব্যাংগালোর এসে পৌছালাম। এখানে ব্যাংগালোর শহর এবং মহীশূর শহর ঘুরে দুই দিন পর আবার এক রাতে মাদ্রাজের ট্রেনে চেপে বসলাম।

সেই শীত কাটিয়ে আবার পরদিন মাদ্রাজ এসে পৌছালাম খুব ভোরে।

মাদ্রাজে এক দিন এক রাত থেকে আবার একটু ডাক্তার দেখালাম এবং শুধু মেরিনা বিচ ঘুরে পরদিন সকালে আবার হাওড়ার ট্রেনে চেপে বসলাম।

এই ট্রেনেও বসে বসে মনোরম সব প্রাকৃতিক দৃশ্য, সবুজ পাহাড়, পাথরের পাহাড়, নানান ফসলের ক্ষেত, সমুদ্র, নদী ইত্যাদি দেখে দেখে মনটা এক অজানা ভালো লাগায় ভরে উঠছিল।

তাছাড়া এই ট্রেনেও নানান মজাদার খাবার, গাছ থেকে পাড়া তাজা কমলা, আঙুর, পেয়ারা এবং সবজি বিরিয়ানি ইত্যাদি খেতে খেতে সারা দিন কেটে গেল।

এই ট্রেনে এক মহিলাকে কস্তুরি বিক্রি করতে দেখে খুব অবাক হলাম। ওইগুলো থেকে হালকা সুগন্ধি বের হচ্ছিল।

আবার সেই কনকনে শীতের আরেকটি রাত পার করে পরদিন প্রায় দুপুর দুইটা পঞ্চাশ মিনিটের দিকে হাওড়া এসে পৌছালাম।

২০০২ সালের ডিসেম্বরে আমরা আবারও ইনডিয়ার দার্জিলিং এবং মুম্বাই বেড়াতে যাই। ২০০৩ সালে আমি ও আমার স্বামী মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ যাই। আবার ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে আমরা সবাই মিলে পুনে ও গোয়া বেড়াতে যাই। এভাবে আমরা প্রতিবারই হাজার হাজার কিলোমিটার ট্রেন ভ্রমণ করেছি। কিন্তু দ্বিতীয়বার থেকে আর কখনো কম্বল ও এয়ার বালিশগুলো সঙ্গে করে নিতে ভুলিনি।

সত্যি কথা বলতে কি, ইনডিয়ার ট্রেন জার্নি অনেক আরামদায়ক। ওই দেশটিতে ট্রেন সময় ও নিয়ম মেনে চলতে চেষ্টা করে।

এক কাউন্টারে বসেই অন্য সব জায়গায় যাওয়ার টিকেট কাটা যায়। তাছাড়া ইনডিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাওয়ার জন্য মানে প্রায় সমগ্র ইনডিয়াতেই ট্রেন যোগাযোগ রয়েছে। স্টেশনের নামগুলো স্পষ্টভাবে লেখা আছে যা আমাদের দেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় না।

ওই দেশের সুপারফাস্ট ট্রেনগুলোতে জার্নি করতে বেশি মজা। প্রতিটি বড় স্টেশনেই ট্রেনের টয়লেট পরিষ্কার করে শুকিয়ে দেয়া হয়। স্টেশনগুলো খুব পরিষ্কার।

ট্রেনেই ভাত, রুটি, বিরিয়ানি ইত্যাদি সব রকম খাবার পাওয়া যায়। প্রতিটি স্টেশনে পানির ব্যবস্থা রয়েছে।

সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, ইনডিয়ানরা সাহায্য চাইলে, বিশেষত কোনো জায়গা না চিনলে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। আমরাই অনেকবার অনেকের কাছে সাহায্য পেয়েছি।

কাফকো কলোনি, চট্টগ্রাম থেকে

মুসাফির

- নুরে আলম

নানা রেলওয়েতে চাকরি করতেন। বদলির চাকরি। সাধারণত তিন বছর পর পর এক জেলা শহর থেকে আরেক জেলা শহরে বদলি করা হতো।

মা, খালা, মামারা নানার বদলির সুবাদে একেক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন, বড় হয়েছেন, পড়াশোনা করেছেন, পরীক্ষা দিয়েছেন। অনেক জেলা ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক টানে কথা বলতে পারার সক্ষমতা এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। আম্মার সঙ্গে অনেকেই কথা বলে আশ্চর্য হয় যে, তিনি দক্ষিণ বঙ্গের হয়েও কিভাবে উত্তর বঙ্গের টানে কথা বলেন। তারা জানে না আম্মার অভিজ্ঞতার কথা এবং আম্মাও তা প্রকাশ না করে হাসেন।

নানা যেদিন বদলির হুকুম পেতেন সেদিন বাড়িতে এসে বলতেন, *চলো মুসাফির, বাধো গাঠুরি, যানা হ্যায় বহুত দূর*।

নানার মুখে এ কথা শোনামাত্রই নানিসহ অন্য সবাই বুঝে ফেলতো, নানার বদলি হয়েছে। আরেক জেলায় যেতে হবে। নানার সুবাদে সবাই বিনা ভাড়াতে রেলে ভ্রমণের সুবিধা পেতো।

ভ্রমণপ্রিয় নানাসহ তার বংশধরদের অধিকাংশই সারা দেশসহ সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু পারিবারিক স্মৃতিচারণের সময় নানার সেই উক্তিই সর্বদা আসে এবং সবাইকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয়।

ল্যাবরেটরি রোড, ঢাকা থেকে

দি বৃজ অন দি রিভার কাওয়াই

- কামরুল হাসান

মাহিডল ইউনিভার্সিটিতে ট্রপিকাল মেডিসিনের কোর্সটা শেষ হয়েছে কয়েকদিন আগে। সেপ্টেম্বরের শেষ। এবার ফিরে যাওয়ার পালা। পড়াশোনার চাপ এবং ব্যাংককের ব্যস্ত নাগরিক জীবনের মাঝে সময় করে উঠতে পারিনি তেমন একটা।

থাইল্যান্ডে এসেছি, অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবিস্মরণীয় স্মৃতি *বৃজ অন দি রিভার কাওয়াই* (Bridge on the river Kawai) না দেখেই ফিরে যাবো। সেটা কি করে হয়, সেপ্টেম্বরের এক ঝকঝকে সোনালি সকালে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে সারা দিনের খাবার-দাবার, ক্যামেরা হ্যাট আর সানগ্লাস।

ক্লাসমেট এবং রুমমেট কাউকে কাউকে বলেছিলাম। কিন্তু কারোরই তেমন একটা আগ্রহ নেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এমন একটা বৃজ দেখতে। তাই একাকী। সম্পূর্ণ একাকী যাত্রা।

ব্যাংকক থেকে আশি কিলোমিটার দূরে কাঞ্চনাবুড়ি যেতে সময় লাগলো দুই ঘণ্টা। ব্যাংককের কোলাহল মুখরিত নাগরিক জীবন ছাড়িয়ে সুন্দর ছোট্ট শহর কাঞ্চনাবুড়ি। নয়নাভিরাম, সবুজ ছিমছাম পাহাড়ি শহর। খুব শান্ত আর স্নিগ্ধ। এক কথায় অপূর্ব।

বাস টার্মিনালে নেমে প্রথমেই হোচট খেলাম। এক রিকশাচালক এগিয়ে এলেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি থাই মিশিয়ে তিনি যা বললেন, তোমাকে বৃজ ঘুরিয়ে দেখাবো। তবে তিনশ বাথ (থাই মুদ্রা) লাগবে।

রিকশাচালক ভদ্রলোক অতি চতুর। এতো চতুর লোকের সঙ্গে কথা বলা মুশকিল। কেটে পড়লাম। আশপাশে তেমন কেউ নেই। হঠাৎ নজর পড়লো এক মোটর সাইকেল চালককে। সে যাত্রী বহন করে। ওর কাছে গিয়ে বললাম, আমি কাওয়াই বৃজ দেখতে যাবো।

ও কিছুই বুঝতে পারলো না।

আমি যতোই কাওয়াই বলছি, ও ততোই মাথা ঝাকিয়ে না বলছে।

আমি মরিয়া হয়ে বডি ল্যাংগুয়েজের সাহায্য নিলাম। হাত নেড়ে ঢেউ দেখিয়ে বললাম কাওয়াই। এবার ও চিৎকার করে বললো, *খোয়াইয়া*।

কিছুটা আন্দাজ করে নিলাম কাওয়াইকে হয়তো বা থাই ভাষায় খোয়াইয়া বলে।

ও পনেরো বাথ চাইলো। তিনশ বাথের জায়গায় পনেরো বাথ!

ওর মোটর সাইকেলের পেছনে চড়ে বসলাম। মিনিট সাতেক পর ও আমাকে বিখ্যাত কাওয়াই নদীর পাড়ে বৃজের কাছে নামিয়ে দিল।

ভারী সুন্দর সকাল। সোনালি রোদ। চোখ জুড়ানো পাহাড় আর সবুজ শ্যামলিমা। নদীর তীরের এলোমেলো বাতাসে গরম পালিয়েছে। আজ উইকএন্ড নয়, তবুও অনেক টুরিস্টের ভিড়। কাওয়াই বড় সুন্দর এক স্রোতস্বিনী নদী। সকালের রোদে কাওয়াইয়ের বুকে লাখ কোটি মানিক জ্বলছে। অনেক স্মৃতি ইতিহাস আর দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বয়ে চলছে কাওয়াই। এগিয়ে গেলাম সেই জায়গাটায় যেখানে জাপানিজরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃজটা তৈরি করেছিল।

কিছুটা রেললাইন ও স্লিপার রেখে দেয়া হয়েছে যুদ্ধের স্মারক হিসেবে। তৈরি করা হয়েছে একটি আধুনিক বৃজ কাওয়াইয়ের ওপর দিয়ে। এটা এখন ব্যবহার হয় ট্রেন চলাচলের জন্য। সেই ট্রেনের বগিগুলো রেখে দেয়া হয়েছে নদীর এপারে যেগুলো বৃজ অন দি রিভার কাওয়াইয়ের ওপর দিয়ে জাপানিজরা যুদ্ধ সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যেতো সুদূর বার্মা (মিয়ানমার) ও ইনডিয়া পর্যন্ত।

বৃজ অন দি রিভার কাওয়াই-এর ওপর দিয়ে কিছুটা হাটাহাটি করে রেলিং ধরে দাড়ালাম। নিচে বহমান কাওয়াই। থাই ভাষায় খোয়াইয়া।

এক রূপালী জলধারা। এর বুকে মিশে আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহতদের অশ্রুধারা। পাশেই মিউজিয়াম। সুন্দর করে থরে থরে সাজানো বিভিন্ন সামগ্রী যেগুলো কাওয়াই বৃজ তৈরি করতে জাপানিজরা ব্যবহার করেছিল। মৃত বন্দী সৈনিকদের মাথার করোটি, পরিধেয় বস্ত্র, ব্যবহৃত তৈজস। ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বৃজ তৈরির কর্মকাণ্ড। আরো আছে জাপানিজদের ব্যবহৃত অস্ত্র, বোমা ইত্যাদি। জাপানিজরা বৃজ তৈরির সময় বন্দী সৈনিক, শ্রমিকদের ওপর যে জঘন্য নির্যাতন চালাতো তার কিছু চিহ্ন। সভ্য এবং নম্র জাতি হিসেবে পরিচিত জাপানিজরা যে কতোটা হৃদয়হীন হয়েছিল তার নমুনা দেখে কষ্ট পেলাম।

কাওয়াই নদীর তীরে একটা ছায়াবীথির নিচে বসে লাঞ্চ সারছিলাম। স্যান্ডউইচ আর ফলের রস। চোখে পড়লো নদীর বুকে একটা ফেরি এগিয়ে আসছে। সুন্দর করে সাজানো টুরিস্টরা চেয়ারে বসে নদীর দুই ধারের নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করছে। থাই সিল্কের পোশাক ও খোপায় ফুল জড়িয়ে সুন্দরী এক গায়িকা গান গেয়ে চলছে। দমকা বাতাসে মাঝে মধ্যে গানের মিষ্টি সুর ভেসে আসছে।

প্রকৃতি এবং সুরের মাঝে কিছুটা ডুব দিলাম। এমন সময় কানে এলো *সোয়াদি খাপ* (থাই সম্ভাষণ)।

তাকিয়ে দেখি আমার পাশে হাত জোড় করে বিনীত ভঙ্গিতে দাড়িয়ে এক থাই তরুণ। বললো, আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

ভালোই হলো। আমি একদম একা।

ও আমার কিছু ছবি তুলে দিল। ঘুরিয়ে এটা-ওটা দেখালো। তারপর নিয়ে গেল ওয়ার কিমেট্রতে। সারি সারি করে আর স্মৃতিফলকে লেখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত হওয়া মিত্রবাহিনীর সৈনিকদের নাম পরিচয়। কিছু ইনডিয়ান সৈনিকের নাম চোখে পড়লো। তারাও কাওয়াই নদীর তীরে যুদ্ধে মারা গিয়েছে।

অনেকটা সময় নিলাম দেখে ও আমাকে প্রশ্ন করলো।

বললাম, তুমি কি ভাববে আমি জানি না। তবে গ্রেভইয়ার্ড বা গোরস্থান আমার কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার স্থান। মানুষের শেষ গন্তব্য এটাই। লাস্ট স্টপ। অসম্ভব নীরব শান্ত এবং সুন্দর। এখানে ঘুমিয়ে থাকে জগতের সেরা মানুষ থেকে অতি সাধারণ মানুষ। কোনো ভেদাভেদ নেই। মা ধরিত্রী তাদের ধারণ করেছে, আপন বুকে। আদরে সোহাগে। সূর্য এবং চাদ তাদের আলো ঢেলে দেয়। বাতাস বয়ে যায়। পাখিরা গান গায়। ফুল তাদের গন্ধ বিলায়। দেখো, যে জেনারেলের কাছে আমি কখনো যেতে পারতাম না, এখন তার পাশে আমি শুয়ে আছি। হয়তো কোনো সাধারণ সৈন্যের কবরে ফিসফিস এ কথা শোনা যায়।

ফিরে এলাম মিউজিয়ামে। নদীর ধারে। বৃজের পাশে। খোলা ছাদে এসে দাড়ালাম। চোখে পড়ছে পুরো বৃজ এবং নদী ও দুই পাশের পাহাড় জঙ্গল। মনে পড়ছে সেই বিশেষ উত্তেজনাকর ডেভিড লিন পরিচালিত এবং বেস্ট মুভিসহ একাধিক অস্কার পুরস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র *দি বৃজ অন দি রিভার কাওয়াইয়*-এর কথা। সেই যুদ্ধ, ধ্বংস এবং আত্মত্যাগের কথা। সেই সব বীর সৈনিক যাদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল এ কাওয়াই নদীর পানি।

তখন শেষ বিকেলের কমলা আলোয় ভরে গেছে চারদিক।

তাকিয়ে আছি বৃজের ও প্রান্তের দিকে চোখ রেখে। এমন সময় ট্রেনের হুইসল ভেসে এলো। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো ট্রেনটি। এক সময় চলেও গেল। কিছু ছবি তুলে রাখলাম স্মরণীয় মুহূর্তটির। আজো অ্যালবাম খুলে দেখি সেই স্মরণীয় ছবিটি। ট্রেনটি চলে যাচ্ছে বৃজ অন দি রিভার কাওয়াই-এর ওপর দিয়ে।

জীবনে অনেক ট্রেন দেখেছি। তবে এটির কথা ভোলার নয়।

টরন্টো, কানাডা থেকে

quamrulhassan@hotmail.com

পোর্টার নাম্বার 56

- কে. আহমেদ

১৯৭৮ সাল। দুই বন্ধু যুক্তি করলাম আজমীর শরীফ যাবো। সে মোতাবেক দুজনে রওনা হলাম। কলকাতায় দিনকয়েক থাকার পর আমরা যাত্রা শুরু করবো। কিন্তু এতো দীর্ঘ পথ ট্রেনে রিজার্ভেশন ছাড়া সম্ভব না। তাই পরদিন ইস্টার্ন রেলওয়ের সদর দফতর ডালহৌসি স্কয়ারে টিকেট রিজার্ভেশনের জন্য যাই।

কাউন্টারের বিশাল হলঘরে কয়েকশ লোক। কিন্তু বিড়ি সিগারেটের ধোয়ায় প্রথম কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এটা ধূমপান কর্নার। ভাবলাম এ লাইন শেষ হতে আজ কাউন্টার বন্ধ হয়ে যাবে। আজ আর আমরা টিকেট পাবো না। এই ভাবনায় যখন অস্থির ঠিক তখনই নজরে এলো একটি ছোট সাইনবোর্ড। তাতে লেখা, *ফরেনার্স ওনলি*।

ভাবলাম আমরা তো ফরেনার্স। নির্দিষ্ট রুমে পাসপোর্ট হাতে ঢুকে পড়লাম। ছোট পরিপাটি রুম। মাত্র ছয়জন বসে আছেন। সোফায় যোগ হলাম আমরা দুজন। এর মধ্যে একজন মরিশাসের, বাকি পাচজন বাংলাদেশি। আরো ভালো লাগলো এই পাচজনের একজন হচ্ছে আমার বন্ধুর ছোট ভাই।

যাহোক এক সময় আমার মুখোমুখি হওয়ার পালা। পাসপোর্ট দুটোসহ আমিই অফিসারের সামনে গিয়ে কথা বললাম। মনে হলো তিনি বাঙালি।

তিনি বললেন, পনেরো দিনের আগে দিল্লিগামী *কালকা মেল*-এর কোনো টিকেট নেই।

কিন্তু পনেরো দিন কলকাতার মতো শহরে হোটেলে থাকা সময় ও অনেক টাকার ব্যাপার। তাই সাহসে ভর করে ভদ্রলোকটিকে বললাম, এনি অলটারনেটিভ? আর কোনো পথ আছে কি?

তিনি ফিক করে হেসে বললেন, বাইরে যান এবং পাসপোর্ট প্রতি দশ টাকা পাসপোর্টের মধ্যে পুরে আবারও লাইনে আসুন।

দূরে সোফায় বসে থাকা বন্ধুটি এসবের কিছুই টের পেল না। বাইরে এলে বন্ধুটি বললো, ঘটনা কি? টিকেট হবে না।

হ্যা সূচক জবাব দিতে দিতে দুইটা দশ টাকার নোট পাসপোর্টের ভাজে পুরে আবারও ভেতরে গিয়ে সোফায় বসলাম। ধীরে লাইন এগোচ্ছে। এক সময় আমার পালা এলো।

পাসপোর্ট ডেস্কের ওপর রাখলাম।

ভদ্রলোক অতি বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইলেন সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না?

মাথা নেড়ে হ্যা সূচক জবাব দিতেই পাসপোর্ট দুটো ডেস্ক থেকে নামিয়ে ভেতরের টাকাটা ড্রয়ারজাত করে তার পরদিন রাত সাড়ে আটটার কালকা মেলের দুইটা টিকেট বরাদ্দ করলেন এবং বললেন, বাইরের কাউন্টার থেকে দুইটা রিজার্ভেশন টিকেট নিয়ে আসুন, আমি সিট নাম্বার বসিয়ে দেবো।

দুইটা সেকেন্ড ক্লাস রিজার্ভেশন টিকেট পেয়ে মহা আনন্দে ওই দিনের মতো আমরা বিজয়ী বেশে ফিরে এলাম।

পরদিন সন্ধ্যার পূর্বেই হাওড়া স্টেশনে পৌছে গেলাম। যথাসময় ট্রেনে চাপলাম। মজার ব্যাপার হলো,ওই বগির প্রতিটি যাত্রীই ছিলেন বাংলাদেশি। এক সময় আলাপ হলো। একজন দিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত, তিনজন আগ্রা যাবেন এক পীরের পানি পড়া আনতে। আর যাকে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তিনি হলেন মোস্তফা মেহমুদ চিত্রপরিচালক। সস্ত্রীক সঙ্গে নয় বছরের জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী এক কন্যা যার সুস্থতার জন্য খাজা বাবার দরবারে যাচ্ছেন। ওনার মেয়েকে স্ট্রেচারসহ ওঠা-নামায় আমরা সাহায্য করেছিলাম।

পরদিন রাত দশটায় দিল্লি পৌছালাম। পুরো ভ্রমণটা বেশ আরামদায়ক ছিল বলা যায়।

দিল্লিতে থাকা নিয়ে সারা যাত্রাপথে ঠাট্টা–তামাশা করলাম। সেই মিশনে চাকুরে ভদ্রলোক কিছু না বলে ট্রেনের চাকা সচল থাকতেই কখন যে নেমে গেলেন জানলাম না। অবশ্য আমরা তার সঙ্গে কখনোই যেতাম না। তিনি দিল্লিতে অনেক দিন আছেন। একটা ভালো হোটেলের ঠিকানা তো তিনি দিয়ে যেতে পারতেন!

ওই রাতে আমরা প্রতি সিট দশ টাকা করে দিয়ে ডরমিটরিতে থেকে গেলাম। দুজনে মিলে আমরা একটি রুম, দুইটি সিঙ্গল বেড, একটি ড্রেসিং টেবিল কাম আলমারি সর্বোপরি সারাক্ষণ অ্যান্টেনডেন্ট। পরদিন দিল্লি ঘুরে আবার মতলব আটলাম কিভাবে আজও রেলওয়ের ডরমিটরি ভাড়া পাওয়া যায়।

টিকেট আনতে গেলে অফিসারটি বললেন, দুরপাল্লার যাত্রী, বিশেষ করে রাতে যারা এখানে আসেন কেবল তারাই এক রাত এখানে থাকতে পারেন।

আমরা পীড়াপীড়ি করাতে তিনি বললেন, দারোয়ান যদি লিখে দেয় যে, সিট খালি আছে তাহলে টিকেট দিতে পারি।

দারোয়ানকে বলার পর দারোয়ান যা বললো তাতে বাংলাদেশি হিসেবে আমার খুব হাসি পেল। কারণ মাত্র তিন টাকা লাগবে জনপ্রতি অতিরিক্ত। ছয় টাকা দিয়ে দারোয়ানকে দিয়ে লিখে নিয়ে মাত্র কুড়ি টাকায় আরেক রাত ডরমিটরিতে থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

পরদিন রাতের ট্রেনে আজমীর যাত্রা করলাম। ভোরবেলা পৌছে গোসল সেরে মাজার জিয়ারতে গেলাম। জুমার নামাজ আদায় করে দরগাহ চত্বর থেকে আংটিতে পরা পাথর কিনে চত্বরের এক কোণে বসে আছি। এমন সময় এক বিশালদেহী হাতিওয়ালা ভদ্রলোক আমাদের পরিচয় জানতে আগ্রহী হলেন।

পরিচয় পর্বের পর দুপুরে তার বাড়িতে খানা খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।

আমরা যাবো না।

তিনি নাছোড়বান্দা।

শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর ওপর ভরসা করে ওনার নিমন্ত্রণ কবুল করলাম। সে এক শাহীখানা। চার তলা নিজস্ব বাড়ি, ওনার ছোট ছেলে হাফেজ, চারজন যে গদিনশীন আছেন খাজার দরবারে তিনি তাদের একজন।

আহারান্তে আজমীর রেলওয়ে স্টেশনে এলাম। দিল্লিগামী ট্রেন আছে সন্ধ্যা ছয়টা বিশ মিনিটে আগমন, সাড়ে ছয়টায় বহির্গমন। তাছাড়া আর কোনো ট্রেন নেই। টিকেট আছে। কিন্তু সিট রিজার্ভ কোনো টিকেট নেই।

আমি খুব ঘুম কাতুরে মানুষ। তাই রিজার্ভেশন ছাড়া যাবো না। আমাদের এই ঘোরাঘুরি এবং দুঃশ্চিন্তা কারো চোখে না পড়লেও দৃষ্টি এড়ায়নি স্টেশনের কুলি দিওয়া রামের।

সে কাছে এসে বিনীতভাবে জানতে চাইলো, সমস্যা কি?

জবাবে সে জানালো, চিন্তা করবেন না। টিকেট যথাসময়ে পেয়ে যাবেন। কারণ খাজা কাউকে কষ্ট দেয় না। তার কথায় বিশ্বাসও পাই না আবার উপায়ও নেই।

বিকেলে তাকে বললাম, দিওয়া রাম ব্যবস্থা হলো? কিছু টাকা দিই আগাম।

সে তার লাল হাফহাতা জামার বুক পকেট থেকে কয়েকশ টাকা বের করে বললো, বাবু দিওয়া রাম গরিব। কিন্তু টাকার লোভ নেই।

ছয়টা বিশ মিনিটে ট্রেন এসে গেছে, তখনো কোনো খবর নেই টিকেটের।

দিওয়া রামজি কি খবর?

জবাবে, *বাবু ঘাবড়াও মাত। খাজাকি দোয়ায়ে সব কুছ মিল জায়েগি।*

ছয়টা পচিশ মিনিটে দিওয়া রাম – আর তো সময় নেই, কি হবে?

এবার দিওয়া রাম রাগান্বিত স্বরে কিন্তু হাসি মুখে বললো, *যব তক তেরা টিকেট নেহি মিলি তব তক ট্রেন নেহি ছুটেগি।*

এ যেন হিন্দি সিনেমার ভিলেইনের ডায়ালগ। কি আর করা! চুপচাপ ব্যাগটা দুই পায়ের মাঝে নিয়ে দাড়িয়ে আছি। ছয়টা সাতাশ মিনিট। দিওয়া রাম গার্ডের সঙ্গে কি যেন ফিসফাস বলে আমাদের ডাক দিল এবং ব্যাগসহ ট্রেনে তুলে দিল।

বললাম, কতো দেবো?

সে টিকেটের দাম ছাড়া মাত্র পনেরো টাকা বেশি চাইলো যা ছিল আমাদের ধারণার বাইরে। উপরন্তু এমন লম্বা সালাম দিল যে, তা জীবনে ভোলার নয়। ছিপছিপে গড়নের মধ্যবয়সী দিওয়া রাম বেচে আছে কি না জানি না। সালামের সঙ্গে সঙ্গে তার আবেদন, *ফেরভি আজমীর আয়ে গা তো দিওয়া রামকি স্মরণ করেগা। মেরা নাম দিওয়া রাম, পোর্টার নাম্বার 56।* বলে ডান হাত দিয়ে ইশারায় বাম হাতের ডানায় বাধা পিতলের চকতিটাকে দেখালো সে।

ট্রেনের চাকা গড়াতে শুরু করেছে।

আমি অপলক ভাবে চেয়ে আছি তার অসাধারণ গোফ জোড়ার দিকে।

মেহেরপুর থেকে

রূপসা এক্সপ্রেস

- লিটন

আমি আর আমার স্ত্রী ফুলবাড়ি থেকে ভেড়ামারা আসবো। আন্তঃনগর ট্রেনে পাচ ঘণ্টার যাত্রা। আমাদের দুজনারই বাসের চেয়ে ট্রেনে ভ্রমণ প্রিয়। অবশ্য তা ভালো ট্রেন হতে হবে। আমি আবার লোকাল ট্রেন দেখতে পারি না।

স্ত্রীর নাম মুক্তা। আমরা দুটো চেয়ার কাচের টিকেট কেটে নিলাম। নির্দিষ্ট সময়ে *রূপসা এক্সপ্রেস* প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে গেলে নির্দিষ্ট সিটে গিয়ে বসলাম।

ট্রেন তার নির্দিষ্ট গতিতে এগিয়ে চলছে। স্বামী-স্ত্রী হলেও আমাদের মেলামেশা নতুন প্রেমিক-প্রেমিকার মতো।

জয়পুরহাট পার হওয়ার পর জানালা দিয়ে উদাস ভঙ্গিতে বিস্তীর্ণ খোলা প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছি। দূরের, বহু দূরের গাছপালা, ঘর বাড়ি আমাদের বিপরীত দিকে ছুটে চলেছে। আমি মুগ্ধ চোখে দেখছি।

মুক্তার মিষ্টি চুমুর স্পর্শে আমার মুগ্ধতা কাটে। মুক্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ দেখেনি তো।

মুক্তা বললো, ওই পিচ্চিটা দেখে ফেলেছে।

তাকিয়ে দেখি তিন বছরের বাচ্চা মেয়েটি মিটি মিটি হাসছে আর ওর বাবা-মাকে কি যেন বলছে।

মুক্তা এমনই একজন, যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সুযোগ বুঝে সে চুমু দেবেই। সমস্যা একটাই, তাকেও একইভাবে চুমু দিতে হবে। না দিলে ভীষণ রাগ করে। দিনে-রাতে কম করে হলেও মুক্তা আমাকে বিশ ত্রিশটা চুমু দেবেই। একইভাবে আমাকেও তাই করতে হয়।

এক সময় তা বিরক্ত লাগতো। অবশ্য এখন আর লাগে না। সয়ে গেছে।

ট্রেনের মধ্যে মুক্তাকে চুমু দিচ্ছি না দেখে আমার ওপর সে রেগে গেল। ওর আবার ভীষণ রাগ। অবস্থা বেগতিক দেখে মুক্তাকে খাবার গাড়ির পাশেই একটা ছোট ফাকা রুমে নিয়ে গেলাম। খাবারের অর্ডার দিলাম। অবশ্য এই জায়গাটি পেতে ক্যান্টিনের বেয়ারাটি সাহায্য করেছে।

বেয়ারা বললো, আপনারা এই রুমটিতে বসুন। এখানে আপনারা যতোক্ষণ ইচ্ছা গল্প করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি খাবার দিয়ে যাচ্ছি।

লোকটি আমাদের কি ভেবেছে তা সেই জানে। হয়তো প্রেমিক-প্রেমিকা।

এবার আমার বৌ খুব খশি এমন একটা রুম পেয়ে।

মুক্ত বললো, দেখেছো, এরা যুগলদের জন্য কতো সুন্দর রুম রেখেছে!
এখানে আমরা ইচ্ছামতো চুমু বিনিময় করতে পারলাম।
একটু ক্ষতির মধ্যে খাবারের দাম নির্দিষ্ট দামের দ্বিগুণ দিতে হয়েছে। তাকে কি? বৌয়ের মুখের মিষ্টি হাসি তো দেখতে পেয়েছি।
ধন্যবাদ রূপসা এক্সপ্রেস।

রাজাপুর, নাটোর থেকে

বই

- মাখরাজ খান

আমি থাকতাম গণ্ডগ্রামে, আর সে থাকতো চট্টগ্রামে। জানতাম ফরিদা বাটালি হিলের কোনো এক বাড়িতে থাকে। তার স্বামী, সন্তান, সংসার নিয়ে সুখেই আছে। আমি এই গণ্ডগ্রামে পড়ে আছি আর ছাত্রদের সঙ্গে চেচামেচি করছি।
একদিন ফরিদার ভাই বাবু এসে বললো, রাজভাই, আপনাকে আপা যেতে বলেছেন।
আমাকেও যে কেউ যেতে বলতে পারে এটা আমার কাছে ছিল অবিশ্বাস্য। কারণ আমি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কেউ নই, এমনকি নিজের কাছেও আমার কোনো দাম আছে বলে মনে হয় না। তবু ফরিদা যখন যেতে বলেছে তখন অবশ্যই যাবো। আমাকে যেতে হবে।
স্কুল থেকে সাত দিনের ছুটির দরখাস্ত করলাম।
হেডমাস্টার ছুটি দিতে চান না। তিনি বললেন, সামনে টেস্ট পরীক্ষা। এ সময় ছুটি নিলে ছাত্রদের ক্ষতি হবে, জানেন তো এখন ছাত্ররা ইংরেজি আর অংকে ফেল করে। টেস্ট পরীক্ষা হোক, তখন পনেরো দিনের ছুটি পাবেন।
চুপ থাকলাম।
হেডমাস্টার রফিকুল ইসলাম দেখলেন, আমি বুঝতে চাইছি না। অগত্যা ছুটি মঞ্জুর করলেন।
সাটুরিয়া থেকে সোজা চলে গেলাম কমলাপুর। রাতে চট্টগ্রামের ট্রেন। আমার সঙ্গে কোনো লাগেজ নেই, শুধু একটা হ্যান্ডব্যাগ, একটা প্যান্ট, দুটো শার্ট, গেঞ্জি আর দুই চারটা বই। আমি সব সময়ই আমার সঙ্গে কিছু বই রাখি।
এটাই আমার ফার্স্ট ট্রেন জার্নি। কেমন জানি একটা বোকা বোকা লাগছে। থার্ড ক্লাসে উঠে জানালার কাছে একটা সিট নিয়েছি। কাঠের হেলানো সিট। ব্যাগটি হাতের কাছে রেখে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছি। এমন সময় একজন মধ্যবয়স্ক লোক এসে বললেন, আমি কি আপনার এখানে বসতে পারি?
উত্তর দিলাম, ও শিওর।
তিনি বসে পড়লেন। তার হাতের ব্যাগটা রাখলেন আমার পায়ের কাছে। আর মাথাটা রাখলেন আমার কাঠের ওপর।
আমি তো প্রথম ট্রেন যাত্রী তাই বোকা। যদিও এতোটা বোকা নই যে, ট্রেনে যারা প্রথম ভ্রমণ করে তাদের কাধে বহু ভ্রমণকারীরা মাথা রাখে। কিন্তু আমার কেন যেন লজ্জা করতে লাগলো। কিছু বলতে পারছি না, মাথা সরিয়েও দিতে পারছি না। ট্রেন তখন ঢাকার কাওরাইদ পার হয়ে গেছে।
কি করা যায়, কি করবো? এই যখন ভাবছি তখন এক ক্যানভাসার হঠাৎ তার সিট থেকে উঠে ব্যাগ থেকে কিছু বইপত্র বের করে বইগুলো বিক্রির জন্য ক্যানভাস শুরু করে দিল।
সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কেউ কিনছে না।

ক্যানভাসার মনে করলো হয়তো আমার পাশের ঘুমন্ত লোকটা তার বই কিনতে পারে, এই ভেবে সে ঘুমন্ত ভদ্রলোককে এসে আলতো করে ধাক্কা দিয়ে বললো, মাফ করবেন স্যার। যানবাহনে ঘুমানো ঠিক নয়, যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

ভদ্রলোক চোখ ডলতে ডলতে ওঠে হাই তুলে বললো, জেগে থাকলে বুঝি দুর্ঘটনা হবে না!

ক্যানভাসার চুপ। তবে ক্যানভাসারদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ কথায় পারবে কেন?

ক্যানভাসার বললো, তা পারে। তবে সেক্ষেত্রে ঘুমন্ত মানুষের চেয়ে জাগ্রত মানুষের সুবিধা বেশি। দেখেননি লঞ্চডুবিতে যারা জেগে ছিল তারা বেচে গেছে আর যারা ঘুমিয়ে ছিল তারা পরপারে চলে গেছে। তাই জেগে থাকা ভালো, জাগাই হলো জীবন এবং ঘুম হলো মৃত্যু।

কিন্তু এখন তো রাত। এই রাতে কি সব মানুষ জেগে থাকতে পারে? রাতে তো জেগে থাকে শুধু চোর, ডাকাত আর পুলিশ। আমি তো অনেক চেষ্টা করেও রাত দশটার বেশি জাগতে পারি না।

ক্যানভাসার জবাব দিল, পারবেন মিস্টার, একটু চেষ্টা করলেই পারবেন।

কি বলছেন পারবো?

হ্যা পারবেন।

তা হলে বলুন, কিভাবে পারবো?

এই নিন। এই বলে সে গোটা চারেক বই ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে দিল।

এগুলো তো বই।

হ্যা বই। আপনি এগুলো পড়বেন। এগুলো পড়লে আপনার ভাবতে ইচ্ছা হবে এবং ভাবতে ইচ্ছা হলেই এরপর কি আছে জানতে ইচ্ছা হবে। তারপর আর ঘুম থাকবে না।

ঠিক তো?

হ্যা।

ভদ্রলোক একটা স্বামী–স্ত্রীর গোপন জাতীয় একটা বই কিনলেন।

এরপর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আবার আমার কাধের ওপর মাথা রাখতে চাইলেন।

কিন্তু না, আমি ক্যানভাসারের কথা শুনে কিছুটা বোকামি ঝেড়ে ফেলেছি। তাই কাধ সরিয়ে নিলাম।

ভদ্রলোককে বাধ্য হয়ে জেগে থাকতে হলো। কিন্তু তিনি ওই গোপন জাতীয় বইয়ের একটা অক্ষরও পড়লেন না।

সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ থেকে